বয়ন-বিদ্যা

বা

তাত-শিক্ষা।

ভারতের বস্ত্রশিল্প।

প্রথম অধ্যায়।

ইতিবৃত্ত।

কার্পাসবস্ত্র যে, আমাদের ভারতবর্ষে কতদিন প্রচলিত আছে, তাহা ঠিক করিয়া বলিবার যো নাই। পৌরাণিক প্রবাদে বস্ত্রশিল্পের বি ইতিবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদে প্রকাশ ;—

যখন বস্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই, তখন দেব দানব মানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর সকলকেই, বৃক্ষবল্কল বা পশুচর্ম্মে, লজ্জানিবারণ করিতে হইত। সেই সময়েই একদা বিষ্ণুলোকে নারায়ণের ভবনে একটা প্রীতিভোজের আয়োজন হইয়াছিল। ব্রহ্মা ব্রহ্মাণী, শঙ্কর শঙ্করী, ইন্দ্র ইন্দ্রাণী প্রভৃতি

সেই প্রীতিভোজে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নারায়ণী-লক্ষ্মীকে পুরুষ-দিগেরও ভোজনকালে পরিবেষণ করিতে হইয়াছিল। বল্কলবসনা লক্ষ্মী যখন পরিবেষণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সহসা বল্কলের কটি-বন্ধন খসিয়া পড়ায়, লক্ষ্মীকে বড়ই লজ্জা পাইতে হইয়াছিল। সেই জন্যই, স্বয়ং কৃত্তিবাস মহাদেব জটা হইতে তন্তুবায়কুলতিলক শিবদাসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই শিবদাসই, স্বর্গের ইঞ্জিনীয়ার যন্ত্রশাস্ত্রবিৎ বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে, তাঁত, চরকা ও টাকু প্রস্তুত করিয়া, বস্ত্রবয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানসোদ্ভূত দ্বিতীয়-কল্পবৃক্ষ কার্পাস হইতে তুলা লইয়াই, শিবদাসকে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। শিবদাস-নির্ম্মিত বস্ত্র দেবলোক হইতে মানবলোকে আসিয়াছিল। সেই অবধিই শিবদাসের বংশধরদিগকে জগতের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইতেছে।

এই পৌরাণিক প্রবাদবৃত্তেই বুঝা যাইতেছে, বস্ত্রশিল্প ভারতেরই আদিশিল্প ; ভারত হইতেই বস্ত্রশিল্প ক্রমে পৃথিবীর চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। বোম্বাই সহরের বিখ্যাত বস্ত্রশিল্পী এবং বোম্বাই ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য মান্যবর বিটলদাস দামোদর থ্যাকার্সী বলিতেছেন ;—

অতীতের ইতিহাসে

দেখিতে পাই, বস্ত্রশিল্প ভারতে অতিপ্রাচীনকালেও বিলক্ষণ উন্নতি-লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে দেখি, পঞ্চসহস্র বর্ষ পূর্ব্বেও এই ভারতভূমি বিচিত্রবস্ত্রের জন্য জগদ্বিখ্যাত ছিল। তখনও ভারত-বাসীরা সূক্ষ্ম সুন্দর শ্বেত বস্ত্রে দেহশোভার বর্দ্ধন করিতেন ; নানাবর্ণে বিরঞ্জিত উৎকৃষ্ট সুকুমার বস্ত্রও অনেকের দেহকে অলঙ্কৃত করিত।

এখন যেরূপ খাপি খুপ্‌সরত নয়নসুখ কেম্ব্রিক প্রভৃতি সুকোমল মসৃণ চিক্কণ বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তখনও সেইরূপ সুকুমার শ্বেত বস্ত্র ব্যবহৃত হইত। এখন যেরূপ ঘন সূক্ষ্ম ম্যাঞ্চেষ্টারী মলমল বসনবিলাসীদিগকে তুষ্ট করে, তখনও এদেশের সেইরূপ বস্ত্র তৎকালীন বস্ত্রবিলাসীদিগকে আনন্দিত করিত। তখনকার ভদ্র শিক্ষিত সম্ভ্রান্তসমাজে ধপ্‌ধপে শুভ্রবসনই আদৃত হইত, রমণীসমাজে রঞ্জিত বস্ত্রেরই আদর ছিল।"

চেলী, গরদ, তসর প্রভৃতি কৌষেয় বস্ত্র অতিপবিত্র অথচ বহুমূল্য বলিয়া, ধর্ম্মকর্ম্মেই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত; আর রাজভবনে ও ধনিভবনেই কৌষেয় বস্ত্রের বাহুল্য ছিল। মহাচীন বা চীনদেশ হইতেও তখন উৎকৃষ্ট কৌষেয় ভারতে আসিত। এই জন্যই কীটকোষ-নিঃসৃত সূত্রে নির্ম্মিত কৌষেয় বা রেশমী কাপড় এখনও, চীনাংশুক বা চীনবস্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

ছাগ-মেষ-লোমজ ঔর্ণবস্ত্রও ভারতের অপরিচিত ছিল না, তিব্বতদেশীয় ছাগলোমের শাল রুমাল অতিপূর্ব্বকালেও ভারতের কুবেরকল্প ধনপতিদিগকে পরিশোভিত করিত। মেষলোমজাত কম্বলে সকলেরই শীতনিবারণ হইত। মেষলোমজাত সুকোমল বসন তখনও এখনকার বনাতের কার্য্য সম্পন্ন করিত। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে লোমজবস্ত্র শীতকালেই ব্যবহৃত হইত, কার্পাসবস্ত্রের ব্যবহার বারমাস চলিত; রেশমী চেলী গরদ পবিত্রকার্য্যে ও উৎসবে বারমাসই পরিহিত হইত।

বস্ত্রের রপ্তানী।

ভারতের উৎকৃষ্ট সর্ব্ববিধ বস্ত্রের ন্যায় কার্পাসবস্ত্রও অতিপূর্ব্বকালে

পৃথিবীর চারিদিকে নীত ও ব্যবহৃত হইত। রোমরাজ্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্লিনি ৭৩ খৃষ্টীয় বর্ষের বাণিজ্য বৃত্তান্তে বলিতেছেন,

"ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে নানারূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্য আসিয়া থাকে। কিন্তু ভারত হইতে যে কার্পাসবস্ত্র আসে, তাহার তুলনা হয় না।"

সীজর, অগষ্টস প্রভৃতি রোমকসম্রাটদিগের রাজপরিচ্ছদেও ভারতীয় বস্ত্রই ব্যবহৃত হইত। ভারতীয় বসনের বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ দেখিয়া, পৃথিবীর সকলকেই মুগ্ধ হইতে হইত। ঢাকার দেবদুর্লভ বস্ত্র দেখিয়া, তথন দেবতাদিগকেও বিহ্বল হইতে হইত। ঐতিহাসিকেরাই বলিতেছেন,

"সপ্তদশশত বর্ষ পূর্ব্বেও ঢাকার মলমল ইউরোপকে বিস্ময়সাগরে ভাসাইত। "আব্-রোঁয়া" বা জলপ্রবাহবৎ সূক্ষ্ম সুকোমল মলমল দেখিয়া, শতকুবেরবিজয়ী রোমকসম্রাটদিগকেও বিস্ময়বিহ্বল হইয়া থাকিতে হইত।"

ভূমিকায় সকল কথা কহিব না। কার্পাসবস্ত্রে যে, ভারত অদ্বিতীয় ছিল; অদ্বিতীয় ভারতের বঙ্গ যে, একান্ত অদ্বিতীয় ছিল; তাহা সকলেরই সুবিদিত আছে। কেবল ঢাকার নহে, বঙ্গের নানাস্থানই পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। নদীয়া জেলার শান্তিপুরও অনেকাংশে ঢাকার সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গের অম্বিকা, কাল্না, কল্মে প্রভৃতিও বস্ত্রশিল্পে হীন ছিল না। যে ফরাসডাঙ্গা ও লালবাগান এখনও সুকুমার বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত, তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি পূর্ব্বে আরও ছিল; বঙ্গের চারিদিকেই তন্তুবায়কুলতিলকেরা আপনাদের করকৌশলে সকলকেই মুগ্ধ করিত।

কলই কাল।

পূর্ব্বকালে যখন ভারত কার্পাসশিল্পে জগদ্বিখ্যাত এবং অদ্বিতীয় ছিল, তখন ইংলণ্ড স্কটলণ্ডাদির নামও পৃথিবীর কেহ জানিত না। ভারত যখন সর্ব্ববিদ্যা ও সর্ব্বশিল্পে বিশ্ববিজয়ী হইয়া বিরাজ করিতেছিল, তখন বনময় গ্রেটব্রটন বর্ব্বর বন্য মানবে পূর্ণ ছিল। শেষে রোমক বিজেতাদের হাতে পড়িয়া বিলাত সভ্যতার মুখ দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও বিলাতের লোকে সুকুমারশিল্পের মুখ দেখিতে পান নাই। বিলাতের লেকে যখন বৃক্ষবল্কল ও পশুচর্ম্ম ছাড়িয়া বস্ত্র ধরিয়াছিলেন, তখনও পশুলোমেই তাঁহাদের পরিধেয় উত্তরীয় প্রস্তুত হইত। যখন স্টীশজাতি আরও সভ্য হইয়াছিলেন, তখনও স্বদেশীয় মসীনাবৃক্ষের সূত্রেই ছালটীর কাপড় প্রস্তুত করিতেন। অনন্তর যখন বিলাতের লোকে তাঁত চরকার কৌশল বুঝিয়াছিলেন, তখন ভারতের কার্পাস-তুলায় স্থূল কর্কশ বস্ত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও সূক্ষ্ম সুকুমার বস্ত্র ভারত হইতেই বিলাতে যাইত। রাজ্ঞী এলিজেবেথের সময়ে যে কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যে কোম্পানি অনতিপরে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" নামে পরিচিত হইয়া, ভারতের সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; সেই কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের বস্ত্রবাণিজ্যে আধিপত্য করা। কোম্পানির ভারতীয় কর্ম্মচারীরাও প্রথমে ভারতের চারিদিকে বস্ত্রসংগ্রহ করাকেই মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বঙ্গেই যে তাঁহাদের বস্ত্রব্যবসায় প্রবল হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সেই সময়ে এদেশের চারিদিকে কাপড় সূতার যে সকল কুঠী কারখানা বসিয়াছিল, তাহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু এ সকল

কথা পরে কহিব; সূত্র ও বস্ত্রের বিবরণে কুঠী কারবারের কথাও কহিব।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় কর্ম্মচারীরা ভারতীয় বস্ত্রবাণিজ্যে একান্ত মত্ত ছিলেন। তখন এদেশের কার্পাস-চাষে এবং সূত্রবস্ত্রশিল্পে উৎসাহ দেওয়া ও সাহায্য করাই, তাঁহাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। ১৭৭২ অব্দেই ভাবান্তরের সূত্রপাত হইল। আর্করাইট এবং হারগ্রেভ স প্রভৃতির উদ্ভাবিত ও পুনঃসংস্কৃত কলের তাঁতে নির্ভর করিয়া, ব্লাকববণের তন্তুবায়েরা সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল। ১৭৭৯ অব্দে সূতা-কাটা কল উদ্ভাবিত হইয়া বৃটীশ কার্পাসশিল্পকে উন্নতির উচ্চসোপানে উন্নীত করিয়া দিল। এই সময়েই ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে, বৃটীশ তন্তুবায়দিগের জন্য; আঘাত লাগিতে আরম্ভ করিল। ইতিপূর্ব্বেই বিলাতের স্থূল বস্ত্রশিল্পকে নিরুপদ্রব করিবার জন্য, বিলাতের বস্ত্রশিল্পীরা ভারতীয় বস্ত্রের শত্রুতা করিতেছিলেন; যাহাতে ভারতীয় উৎকৃষ্ট বস্ত্র বিলাতে গিয়া সেখানকার অপকৃষ্ট বস্ত্রকে পরাস্ত করিতে না পায়, তাহার জন্য নানারূপ মুষ্টিযোগের প্রয়োগ হইতেছিল। ভারতীয় বস্ত্রের উপর প্রভূত শুল্ক বা আমদানি-কর চাপাইয়া ও চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিলাতের লোককে তখন ভারতীয় বস্ত্রের ব্যবহার ও ব্যবসায় করিলে, দণ্ডিত হইতে হইত।

যে ভারতীয় বস্ত্রের জন্যই, বিলাতের ধনপতিরা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; যে ভারতীয় বস্ত্রের জন্য কোম্পানির কর্ম্মচারীরা ভারতের চারিদিকে বস্ত্রাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; বিলাতে বস্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা প্রাতপত্তি হইলে পর, সেই ভারতীয় বস্ত্রের বিলাতযাত্রা নানা উপায়ে রুদ্ধ হইয়াছিল। যে কার্পাস-সূত্রের

জন্য, সুঁতানুটী ও হাটখোলা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলিকাতায় পরিণত হইয়াছিল, যে সূতার জন্য কোম্পানির তাঁতশালা ভারতের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই সূত্রেরও বিলাতযাত্রা নানারূপে রুদ্ধ হইয়াছিল।

বিলাতে কলের তাঁত ও কলের চক্র প্রস্তুত হইয়া, যখন প্রভূত সূত্র-বস্ত্র-প্রদান করিতে লাগিল, তখন স্রোত একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইল। তখন চিরগ্রহীতা বিলাত হইলেন দাতা, আর চিরদাতা ভারত হইলেন গ্রহীতা। পূর্ব্বে কোম্পানির কর্ত্তারা ভারতের বস্ত্র সূত্র বিলাতে পাঠাইবার জন্য অসাধ্যসাধন করিতেন, পরে বিলাতের বস্ত্র সূত্র ভারতকে দিবার জন্য অসাধ্যসাধন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিলাতে কাপড় সূতার কল যত ফল দিতে লাগিল, ভারতে কাপড় সূতার কাজ তত সংযত হইতে লাগিল। শেষে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোকেই বিলাতী তন্তুবায়দিগের জন্য, ভারতের তন্তুবায়দিগকে বস্ত্রশিল্পে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাহা এখন সর্ব্বজনবিদিত প্রত্যক্ষ সত্য। ভারতের তন্তুবায়কুল ক্রমেই নির্ম্মূল হইল, বঙ্গের তাঁতিকুলকে বৈষ্ণবকুলে পরিণত হইতে হইল। যাহারা রহিল, তাহাদিগকেও বিলাতী সূত্র লইয়া কোনরূপে তাঁতে ভাতে থাকিতে হইল।

এই ভাবে বহুকাল অতিবাহিত হইল; বিলাতের বাষ্পচালিত সূত্রযন্ত্রে অসীম অনন্ত সূত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল, বাষ্পচালিত বয়নযন্ত্রে অনন্ত অসীম বস্ত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। ক্রমে বিলাতের সূত্র বস্ত্রে ভারত আচ্ছন্ন হইতে লাগিল, বিলাতের কাপড়ে ভারতের স্ত্রী-পুরুষেরা লজ্জানিবারণ করিতে লাগিল। আবার, বঙ্গের ব্যবহার্য্য-বস্ত্রে বিলাতের তন্তুবায়েরা নানারূপ পাড় তুলিতে লাগিল। এ পক্ষে বঙ্গের গৃহশত্রুরা

বিলাতী তন্তুবায়দিগের সাহায্য করিতে লাগিলেন; নানাবিধ দেশীয় বস্ত্রের নানাবিধ পাড় কাটিয়া লইয়া, গৃহশত্রুরা বিলাতে পাঠাইতে লাগিলেন। এইরূপেই ক্রমশঃ ভারতকে সর্ব্ববিধ বিলাতিবস্ত্রে আবৃত হইতে হইল।

অনন্তর ১৮৫৪ অব্দে ভারতের বোম্বাই অঞ্চলে বিলাতের মত একটী কাপড়-কল প্রতিষ্ঠিত হইল। পরে বোম্বাই সহরের স্বদেশহিতৈষী—পারসীকপ্রবর জেমশেঠজী টাটা কাপড় সূতার কলে হাত দিলেন। ক্রমেই বোম্বাই গুজরাটে কাপড় সূতার কল বসিতে লাগিল; ক্রমে ভারতের অন্যান্য স্থানেও কল দেখা দিল। এখন ভারতে প্রায় দুই শত কল বসিয়াছে। ভারতের কলেও বৎসর প্রায় ২০ কোটি টাকার সূতা কাপড় প্রস্তুত হইতেছে।

তথাপি বিলাত হইতে আসিতেছে, প্রায় ৪০ কোটি টাকার সূত্র বস্ত্র। ভারতে কল না বসিলে, এত দিনে যে, ৬০ কোটি টাকার আসিত, তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু একটু ভাবান্তর হইয়াছে, নির্ম্মূলপ্রায় তাঁতিকুল আবার ধীরে ধীরে সমূল হইবার লক্ষণ দেখাইতেছে। গরলগাছে অমৃতফল ফলিবার উপক্রম করিতেছে। লর্ড কর্জ্জনের বঙ্গচ্ছেদরূপ বিষবৃক্ষ হইতেই বস্ত্র-শিল্পরূপ সুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আবার বঙ্গের গ্রামে গ্রামে তাঁত বসিতেছে, বঙ্গের সুবাতাস ভারতের চারিদিকে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁতে আবার তন্তুবায়দিগের হাত পড়িতেছে, প্রাচীন পুরাতন শিবদাসের তাঁতে আবার সময়োচিত উন্নতি হইতেছে। বিলাত ও জাপানের উন্নত তাঁত আসিয়া ভারতকে পথ দেখাইতেছে, ভারতেও নানারূপ নূতন তাঁত উদ্ভাবিত ও পরিচালিত হইতেছে। বঙ্গের

কোন কোন শিল্পানুরাগী উদ্যোগশীল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নূতন তাঁত প্রস্তুত করিয়াছেন। কলিকাতাস্থ রাজকীয় শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হেভেল সাহেব, মাদ্রাজের সরকারী শিল্পাধ্যক্ষ চেটার্টন সাহেব, বোম্বাই আমেদাবাদের শিল্পশিক্ষক চর্চ্চিল সাহেব তাঁত-সংস্কারে সাহায্য করিতেছেন। বয়নবিদ্যার শিক্ষাদানেও ইহাঁরা উদাসীন নহেন। কলিকাতার নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-শিল্প-বিস্তারিণী সভা, ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানে, যে সকল ভারতীয় যুবককে বিজ্ঞানশিল্পশিক্ষার জন্য পাঠাইতেছেন, তাঁহারা বস্ত্রশিল্পে শিক্ষালাভ করিতেছেন। এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা জাপানে গিয়াছিলেন, সেখানে বস্ত্রশিল্পে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহাদের দুই একজন প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন।

এখানে বঙ্গচ্ছেদান্তে প্রতিষ্ঠিত নেশনাল ফণ্ড বা জাতীয় ধন-ভাণ্ডার নানাবিধ বয়নযন্ত্রের সাহায্যে বয়নবিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বোম্বাই মাদ্রাজের ন্যায় বঙ্গেও সরকারী তাঁতবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই বিদ্যালয়ের ঘর বাড়ী যন্ত্র তন্ত্রাদির জন্য গবর্ণমেণ্ট লক্ষাধিক টাকা খরচ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; তাঁতবিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যের জন্যও গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ প্রতিবৎসর ৩০ হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মধ্যে গুজব উঠিয়াছিল, সরকারী বয়ন-বিদ্যালয় শ্রীরামপুরে না বসিয়া চুঁচুড়ায় বসিবে। কিন্তু শ্রীরামপুরই তাঁত-বিদ্যালয়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র শ্রীরামপুরে পূর্ব্ব হইতেই তাঁতশালা চলিতেছে, ক্লাইশটল বা ঠকঠকি টাকুর তাঁতও শ্রীরামপুরেই ভাল চলিতেছে। শ্রীরামপুরে তাঁতশালা চলিতেছে; শ্রীরামপুরে তাঁতখানাও চলিতেছে; তাঁতখানায় নূতন ধরণের তাঁত প্রস্তুত হইতেছে। এই তাঁত বঙ্গের চারিদিকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, চারিদিকে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বঙ্গের বাহিরেও

এই তাঁত যাইতেছে। তাঁত-বিদ্যালয়ও বঙ্গের চারিদিকে এবং বঙ্গ-ব্যতীত নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এখনও হইতেছে।

তাঁতের সঙ্গে সঙ্গে টাকু ও চরকার আদরও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বঙ্গের নানাস্থানে নানারূপ চরকা প্রস্তুত হইতেছে, নানারূপ চরকায় সূতা কাটা চলিতেছে। সূক্ষ্ম সূত্রের জন্য তর্ক বা টাকুও নানাস্থানে চলিতেছে।

ফলতঃ বস্ত্রশিল্পে উন্নতির বাতাস লাগিয়াছে। হেভেল, চ্যাটার্টন প্রভৃতি সাহেবেরা বলিতেছেন,

"যে ভারতের লোকসংখ্যা ৩০ কোটি, যে ভারতে মজুর পাওয়া যায় ১০ কোটি, যে ভারতে সূত্র-বস্ত্রের ৫ কোটি শিল্পী দুর্ল্লভ নহে, সে ভারতে উপযুক্তরূপ উন্নত উৎকৃষ্ট তাঁতে ও চক্রে সূত্র-বস্ত্রশিল্প রক্ষিত হইবে না; ইহা মনে করা সুবুদ্ধিসম্মত নহে। হাতের চক্রে সূত্র হইবে, হাতের তাঁতে বস্ত্র হইবে। এই সূত্রের এই বস্ত্রেই ভারত নিজের বস্ত্রাভাব পূর্ণ করিতে পারিবে।"

আমরা কল-কারখানার বিরোধী নহি। কিন্তু বহুব্যয়সাধ্য কল-কারখানায় দৃষ্টি ও যত্ন রাখিয়াও, আমরা তাঁত টাকু ও চরকারও বিস্তার করিতে চাহি। পুরাতন চিরন্তন তাঁত চরকা টাকুকে একেবারে রসাতলে না দিয়া, আমরা নূতন চরকা টাকু ও তাঁতের কার্য্যও চারিদিকে বিস্তৃত করিতে চাহি। কিন্তু কি নূতন কি পুরাতন, সর্ব্ববিধ তাঁত চরকা ও টাকুরই পরিচালনে শিক্ষা আবশ্যক। সূত্রবিদ্যা এবং বস্ত্রবিদ্যা, দুই বিদ্যাই শিক্ষণীয়; বিনা শিক্ষায় কোন শিল্পই চালিত পালিত হয় না।

আমরা বস্ত্রশিল্পে দেশের লোকের অনুরাগ বাড়াইতে চাহি।

সুতরাং বস্ত্রশিল্পের মূলীভূত যে, কার্পাস-কৃষি, তাহাতেও দেশের লোকের আসক্তি বাড়াইতে চাহি। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে, সেই জন্যই, আমরা প্রথমে কার্পাসের কথা কহিব, কার্পাস-চাষের কথা কহিব, কার্পাস-তুলার কথা কহিব, তুলাঘটিত সর্ব্বকৌশলের কথা কহিব; সূতার কথা কহিব, চরকা টাকুর কথা কহিব, সূতা-কাটার কথা কহিব; বস্ত্রের কথা কহিব, তাঁত চরকা টাকু প্রভৃতির কথা কহিব, বস্ত্রযন্ত্রঘটিত সর্ব্ববিধ উপকরণ উপাদান বা তোড়যোড়ের কথাও কহিব। সূতা-কাটা, কাপড়-বোনা প্রভৃতি কার্য্যের সর্ব্ব কৌশল পাঠককে সহজে দেখাইয়া দিব। ফলতঃ, যাহাতে এই বস্ত্র-শিল্প-প্রদর্শক ক্ষুদ্র পুস্তক কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃত পথপ্রদর্শক হইতে পারে, তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কার্পাস।

কার্পাস ভূমণ্ডলের সমস্ত উষ্ণপ্রদেশেই জন্মিয়া থাকে। এশিয়ার অন্যান্য উষ্ণপ্রদেশের ন্যায়, ভারতেও কার্পাসের চাষ হইয়া থাকে। আফরিকার নানাস্থানে কার্পাস জন্মে; মিশরের কার্পাসে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে। আফরিকায়ও এখন প্রভূত কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কার্পাস তিন প্রকার, দুই প্রকার গুল্ম, এক প্রকার বৃক্ষ। গুল্ম-কার্পাস দুই প্রকার, এক

প্রকার ক্ষুদ্র, অন্যপ্রকার একটু বড়। আমরিকার মহাদেশে গুল্ম-কার্পাসই জন্মিয়া থাকে; ইউনাইটেড-ষ্টেটস প্রদেশের গুল্ম-কার্পাসই প্রসিদ্ধ। ভারতেও গুল্ম-কার্পাস জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমরিকার নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে, আটলান্টিক-তীরস্থ কোন কোন স্থানে এবং মেক্সিকো উপসাগরের তীরদেশে গাছ-কার্পাসও জন্মিয়া থাকে। কার্পাস দক্ষিণ-আমরিকায়ও জন্মিয়া থাকে, জামেকা ত্রিনিদাদ প্রভৃতি পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও প্রভূত কার্পাস জন্মিয়া থাকে। ভারতবর্ষেও গাছ-কার্পাসের অভাব নাই। গুল্ম-কার্পাসে যে তূলা ফলে, তাহার অংশু অধিক দীর্ঘ হয় হয় না। গাছ-কার্পাস উচ্চে ১৫।২০ ফুট হইয়া থাকে, ইহার তূলার অংশুও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইয়া থাকে।

উপরেই বলিয়াছি, আফরিকার অনেক স্থানে কার্পাস জন্মে। মিশরের কার্পাসে উৎকৃষ্ট তূলা পাওয়া যায়; কিন্তু আল্‌জিরীয়া প্রদেশের কার্পাসে আরও উৎকৃষ্ট তূলা পাওয়া যায়। চীনদেশও কার্পাসের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। এখন জাপান, অষ্ট্রেলীয়া প্রভৃতি দেশ দ্বীপেও কার্পাসের চাষ হইতেছে; প্রচুর তূলাও নানাস্থানে উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু চীনের মত অতি সুন্দর কোমল জরদ রঙের তূলা অন্যত্র হয় না।

গুল্ম-কার্পাসের চাষ বর্ষে বর্ষে করিতে হয়। গাছ-কার্পাস একবার রোপিত হইলে, অনেক দিন তূলা দিয়া থাকে। কার্পাসের ফলের ভিতরেই তূলা থাকে, ফল পাকিলেই তূলা পরিপুষ্ট হয়। তখন ফলের পাকড়া আপনি ফাটিয়া যায়, কৃষকেরাও সানন্দে পাকড়া ভাঙ্গিয়া তূলা তুলিয়া লয়। কার্পাসের বীজ ক্ষুদ্র; দেখিতে গোলমরিচ, কাবাবচিনি বা কৃষ্ণকলি ফুলের বীজের সদৃশ। এই বীজে তৈল আছে; আমাদের এখানে এই বীজ ঘানিতে ফেলিয়া তৈল বাহির করা হয়, অনেক

স্থানে ঘানি-কলেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমেরিকার বড় বড় ঘানি-কলে প্রভূত কার্পাস-তৈল প্রস্তুত হয়। সে তৈল ইউরোপে আমদানি হয়। অলিভ-তৈলের অনেক কার্য্য এই কার্পাস-তৈলে সম্পন্ন হয়।

এদেশের অনেক ইংরেজ কার্পাসবীজের রপ্তানী বাড়াইতে চাহেন। কিন্তু কার্পাস-বীজে এ দেশে তৈল নিঃসৃত হইলে,যে প্রভূত খলি পাওয়া যায়, তাহা উৎকৃষ্ট সার-রূপে শস্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া, ক্ষেত্রের উৎপাদিকাশক্তি বর্দ্ধিত করে। কার্পাস-বীজের খলি, গোমহিষাদিরও উৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া পরিচিত। এই জন্যই কার্পাস-বীজের রপ্তানী আমাদের পক্ষে প্রার্থনীয় নহে। মধ্যে কৃষিবিভাগীয় রাজপুরুষদিগের উপদেশে গবর্ণমেণ্টও, এই বীজের রপ্তানী পক্ষে উৎসাহ না দিয়া, প্রতিকূলতা দেখাইয়াছেন।

কার্পাস ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বোম্বাই, সিন্ধু, মধ্যপ্রদেশ, বিরার এবং পঞ্জাবেই উৎকৃষ্ট তুলা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের খাস-বঙ্গেও তুলা জন্মে, কিন্তু অধিক নহে। বিহারে বঙ্গ অপেক্ষা অধিক তুলা পাওয়া যায়; ছোট নাগপুরেও উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হইতেছে। বঙ্গের পূর্ব্বসীমান্ত-প্রদেশে কার্পাস চাষের দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে; চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য-প্রদেশে উৎকৃষ্ট তুলা প্রচুর উৎপন্ন হইতেছে। আসামপ্রান্তের পার্ব্বত্য-ক্ষেত্রে যে তূলা জন্মে, তাহা উৎকৃষ্ট। পার্ব্বত্য ত্রিপুরায়ও উৎকৃষ্ট তুলার অভাব নাই।

ফলতঃ ভারতে প্রচুর তুলা জন্মিয়া থাকে; কিন্তু অনেক তুলাই বিদেশে চলিয়া যায়। বিলাতের তন্তুবায়-কলস্বামীরা, এখন মার্কিণ-তুলায় অধিক নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। তুলার জন্য মার্কি-

ণের উপর নির্ভর করিয়া, ইঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে বড়ই অসুবিধা-ভোগ করিতে হয়। এই জন্যই লঙ্কাশায়রের বস্ত্রশিল্পী ধনপতিরা, আপনাদের বৈদেশিক রাজ্যে, তুলার চাষ বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহাদের জন্য ভারতের গবর্ণমেণ্ট তুলার চাষ বাড়াইতেছেন। ভারতে যে, প্রভূত তুলা উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা ১৮৬৪ অব্দে মার্কিণ-গৃহযুদ্ধের সময়ে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। সে সময়ে মার্কিণরাজ্যে কার্পাস চাষ রহিতপ্রায় হইয়াছিল। মার্কিণরাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশেই কার্পাসের লীলাক্ষেত্র। দাক্ষিণাত্যের তুলপতিরা, আফরিকাদেশজ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী লইয়া, কার্পাসের চাষ করিতেন; ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী-দিগকে অতীব নিষ্ঠুরভাবে যন্ত্রণা দিতেন। উত্তরপ্রদেশের মার্কিণেরা, এই দাসত্বপ্রথা রহিত করিবার জন্যই, বদ্ধপরিকর হন। আর এই জন্যই, উত্তরে দক্ষিণে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলে। সেই যুদ্ধে ৬ লক্ষ লোককে প্রাণ দিতে হয়, সেই যুদ্ধে রাজ্যের ২৫০০ কোটি টাকা খরচ হইয়া যায়। সেই যুদ্ধের সময়ে উত্তর দক্ষিণ উভয় প্রদেশের যুবক প্রবীণ সমস্ত সবল সুস্থ পুরুষকেই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিতে হইয়াছিল। সুতরাং দাক্ষিণাত্যের সমস্ত কৃষিক্ষেত্রের ন্যায় সমস্ত কার্পাসক্ষেত্রকে অকৃষ্টভাবে পতিত থাকিতে হইয়াছিল।

কাজেই মার্কিণতুলার উৎপত্তিপক্ষে একেবারেই অভাব হইয়াছিল। আবার মজুত পুরাতন তুলা যদি বিলাতের দিকে প্রেরিত হইত, তাহা হইলে সাগরপথে উত্তরপ্রদেশীয় শত্রুপোতের হাতে পড়িয়া, সাগরগর্ভে নিহিত হইত। এই জন্যই বিলাতের বস্ত্রশিল্পীদিগকে তুলার অভাবে প্রথমে কল বন্ধই করিতে হইয়াছিল; পরে তাঁহাদিগকে তুলার জন্য ভারতের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। ভারতেও কার্পাস-চাষ

সহসা পরাকাষ্ঠায় উঠিয়াছিল। দুই বৎসরে ৫০কোটি টাকার তুলা ভারত হইতে বিলাতযাত্রা করিয়াছিল, তখন ভারতের তুলাতেই বিলাতের বস্ত্রকুবেরদিগকে কোনরূপে বস্ত্রশিল্প বজায় রাখিতে হইয়াছিল। ভারতেও কোন কোন তুলব্যবসায়ী সহসা প্রভূত ধনের উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই, মার্কিণরাজ্যের গৃহবিবাদে সহসা সন্ধি হইয়াছিল, দক্ষিণ-প্রদেশের মজুত তুলা সহসা বিলাতে আসিয়াছিল, ভারতেও তুলার দর সহসা নামিয়া পড়িয়াছিল। ভারতে যাঁহারা ভবিষ্যৎলাভের আশায় লক্ষ লক্ষ টাকার তুলা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মাথায় বজ্রাঘাত হইয়াছিল ; টাটার ন্যায় তুলপতি আমীরদিগকেও সহসা ফকির হইতে হইয়াছিল। লাভের লোভে সকল কৃষক সব চাষ ফেলিয়া,তুলার চাষে মত্ত হইয়াছিল ; সেই চাষে বজ্রাঘাত হইয়াছিল। কাজেই কৃষকদিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল।

মার্কিণ গৃহযুদ্ধের জন্য ভারতে এইরূপ অতুল তুলপ্রলয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেই সময়েই দুইটা রহস্য দূরদর্শীরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন,

“যে ভারত এক বৎসরেই ২৫।২৬ কোটি টাকার তুলা বিলাতের জন্য সহজেই উৎপন্ন করিতে পারিয়াছিল, সে ভারত আবশ্যক হইলে, প্রতিবৎসর ৪০।৫০ কোটি টাকার তুলা বিলাতের জন্য উৎপন্ন করিতে পারে। আর ভারতের যে তুলায় দুই তিন বৎসর বিলাতের কল চলিয়াছিল, যে তুলায় বিলাতের সমস্ত সূতা কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই তুলায় বরাবর কল চলিতে পারে ; সে তুলায় বিলাতের কলে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে।”

অতএব, এখন যাঁহারা ভারতের তুলায় দীর্ঘাংশু না দেখিয়া,

চীৎকার করিতেছেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষের অপলাপ করিতেছেন। ভারতের তুলায়, মার্কিণযুদ্ধের সময়ে, কল চলিয়াছিল। সেই তুলায় চিরদিনই কল চলিতে পারে। তবে, আমরিকা ও আফরিকার দীর্ঘাংশু তুলায় কলের সূত্র যত সহজে প্রস্তুত হয়, ভারতের খর্ব্বাংশু তুলায় কাজ তত সহজে সম্পন্ন হয় না। কিন্তু খর্ব্বাংশু তুলার উপযুক্ত সূত্র-যন্ত্রও যে, প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

যাহাতে ভারতের কলে, খর্ব্বাংশু ভারতীয় তুলা স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। যাঁহারা দীর্ঘাংশুর উপযুক্ত সূত্রযন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, হ্রস্বাংশুর উপযুক্ত সূত্রযন্ত্র তাঁহারাই প্রস্তুত করিতে পারেন। আর, তুলার উন্নতিও ভারতে করা উচিত। মার্কিণ ও মিশ-রীয় কার্পাসের বীজে ভারতেও প্রভূত গুল্ম-কার্পাস উৎপন্ন হইতে পারে। সিন্ধুপ্রদেশের পরীক্ষা ফলবতী হইয়াছে। যাহা সিন্ধুপ্রদেশে ঘটিয়াছে, তাহা নানাপ্রদেশেই ঘটিতে পারে।

আবার ভারতেরই ভিন্ন ভিন্ন কার্পাসে যে, কার্পাসসঙ্কর জন্মিতে পারে, বোম্বাই প্রদেশে তাহাও প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ভগবানের লীলা বুঝা ভার। মধুকরেরা এক পুষ্পে মধুসঞ্চয় করিয়া পুষ্পান্তরেও সঞ্চয় করিতে বসে। এইরূপে যখন উহারা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিতে থাকে, তখন উহাদের পদসংলগ্ন পুষ্পরেণুরূপ পুষ্পবীর্য্য কুসুমকুমারীদের রজোরেণুতে মিশিয়া যায়। এইরূপেই যত পুষ্পপত্নী গর্ভধারণ করে, ঐ গর্ভেই ফল ফলিয়া থাকে। কিন্তু পুষ্পমধুলুব্ধ মধুকর পুষ্প পুষ্পীর সবর্ণতারক্ষা করিতে ব্যস্ত নহে, প্রস্তুতও নহে। তাহার সম্বন্ধ মধু লইয়া; সে শঠ যেখানে মধু পায়, সেইখানেই বসিয়া যায়। এই জন্যই পুষ্পসমাজে অসবর্ণবিবাহ হইয়া থাকে। গোত্রবিচার ত দূরের কথা,

মধুকরের কাছে জাতিবিচারও গ্রাহ্য হয় না। এইরূপেই নানাবিধ উদ্ভিজ্জে বর্ণসঙ্কর জন্মিয়া থাকে; কার্পাসরূপ উদ্ভিজ্জেও এই জন্য বর্ণ-সঙ্কর জন্মিতেছে। এইরূপেই ভিন্নভিন্নজাতীয় কার্পাসে সঙ্করকার্পাস উৎপন্ন হইতেছে; এইরূপ সঙ্করে কার্পাসবংশেরও উন্নতি হইতেছে। মনুষ্যসমাজের জারজেরা বলবিক্রম শক্তিক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জসমাজের জারজেরাও বলে ও ফলে অদ্বিতীয় হইয়া উঠে।

ফলতঃ ভারতের কার্পাসে যে, নানারূপ উন্নতি হইতে পারে, হইয়াও থাকে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। গুল্ম-কার্পাস বা ঝুপী-কার্পাসে যে, এই-রূপে এবং অন্যান্যরূপে ফলোন্নতি হইতে পারে; মার্কিণ মিশরীয় কার্পাসবীজে যে ভারতেও উৎকৃষ্ট তুলা প্রভূতপরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে; তাহা প্রত্যক্ষ ও প্রতিপন্ন হইতেছে। বিলাতের আদেশেই যে, ভারতের সকল গবর্ণমেণ্ট ভারতে কার্পাসের উন্নতি বিস্তৃতি করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টের আদেশে যে,কৃষিবিভাগীয় রাজপুরুষেরা কার্পাসপুষ্টির পক্ষেই অধিক উৎসাহ দিতেছেন; তাহা ভারতের সকলেই দেখিতেছেন।

গুল্ম-কার্পাসের নানারূপ উন্নতি চলে, নানারূপ উন্নতি চলিতেছে। আবার ভারতের গাছ-কার্পাসেও প্রভূত পরিমাণ তুলা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। গাছ-কার্পাসের তুলা স্বভাবতই দীর্ঘাংশু; সুতরাং সে তুলা কলের উপযুক্ত। এই জন্যই ত এ দেশের কোন কোন ইংরেজ গাছ-কার্পাসের বিস্তার ও উন্নতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। বিহা-রের নীলক্ষেত্রে গাছ-কার্পাসের চাষবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইতেছে। অন্যান্য স্থানেও চেষ্টা না হইতেছে, এরূপ নহে।

চেষ্টা প্রশংসনীয়; কিন্তু বিলাতী চেষ্টায় বিলাতের যেরূপ উপকার হইবে, ভারতের সেরূপ হইবে না। যখন গবর্ণমেণ্টকেও বিলাতী সূত্র-

২

কলের জন্য ভারতীয় তুলার বৃদ্ধি করিতে হইতেছে, তখন অত্রত্য বিলাতী বণিক্‌দিগের সর্ব্বচেষ্টা যে, বিলাতী কলের জন্যই পর্য্যবসিত হইবে, তাহা ত সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। আমাদের চেষ্টা আমা-দিগকে করিতে হইবে। ভারতের ভূস্বামীদিগকে অর্থে এবং রাইয়ত-দিগকে সামর্থ্যে কার্পাসকল্পে উন্নতি বিস্তৃতি করিতে হইবে। বঙ্গের কোন কোন ভূস্বামী যত্নবান্ হইয়াছেন, কিন্তু সকলে ত যত্নবান্ হন নাই। আর যেরূপ যত্ন আবশ্যক, যেরূপ খরচ পত্র করা আবশ্যক, সেরূপ যত্ন ও খরচ পত্রও ত সকলে করিতেছেন না।

বঙ্গের যত্নে বঙ্গের সুফল হইবে। বঙ্গের কার্পাস-চাষই, সুতরাং আমাদের প্রধান আলোচ্য। আমাদের বঙ্গে কিরূপ তুলা জন্মিতে পারে, তাহা এক সময়ে ঢাকাই বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রতিপন্ন হইয়াছিল; ঢাকার দৃষ্টান্তই চারিদিকে অনুসৃত হইয়াছিল। অতএব, আমাদিগকেও প্রথমে ঢাকাই কার্পাসের কথা কহিতে হইতেছে; ঢাকার কথায়, পূর্ব্ব-বঙ্গের কথা কহিতে হইতেছে; ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা অঞ্চলের কথা কহিতে হইতেছে। ঢাকাই বস্ত্রশিল্পের আধিপত্যকালে ময়মনসিংহের অনেক অংশ ঢাকা জেলার অন্তর্গত ছিল; ত্রিপুরার তুলাকেও ঢাকাই তুলারই অঙ্গীভূত ও অংশীভূত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্গে—ঢাকা।

যখন টাকু ও চরকাই সূত্রদানে বাধ্য ছিল, যখন তাঁতীর তাঁতকেই কাপড় যোগাইতে হইত, তখন বঙ্গের সর্ব্বত্র কার্পাস উৎপন্ন হইত। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন, বঙ্গের নানাস্থানেই কার্পাস-চাষের স্মৃতিচিহ্ন এখনও বিদ্যমান। কাপাসডাঙ্গা, কাপাসবেড়ে, কাপাস-টিকুরী, কাপাসখোলা, কাপাসতলা, কাপাসবনী, কাপাসবেড়ে, কাপাস-পাড়া, কাপাসতলা প্রভৃতি নাম ধরিয়া বঙ্গের অনেক গ্রাম পল্লী এখনও পূর্ব্বতন কার্পাস-চাষের পরিচয় দিতেছে। ঢাকার কাপাসীয়া যে পূর্ব্বে কার্পাস-তুলার প্রকাণ্ড গঞ্জ ছিল, তাহা এখনও ঢাকাবাসীরা জানেন; তাঁহারা একথা সর্ব্বদা সকলকেই বলিয়া দিতেছেন। এরূপ কার্পাসগঞ্জ যে, অন্যান্য স্থানেও ছিল, তাহা দেখিবার জন্য, প্রত্নতত্ত্বের আশ্রয় লইতে হয় না।

বঙ্গের কার্পাস-কথায় ঢাকার কথাই সর্ব্বাগ্রে কহিতে হয়। সূত্র ও বস্ত্রে ঢাকাই অদ্বিতীয় ছিল; সূত্র ও বস্ত্রের উৎকর্ষে ঢাকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল; কার্পাস তুলার উৎকর্ষে ও প্রাচুর্য্যেও ঢাকাই প্রধানতম বলিয়া পরিচিত ছিল।

পূর্ব্বকথা।

ঢাকা জেলার সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে বস্ত্রশিল্পের আধিপত্য ছিল, কার্পাসের চাষও সর্ব্বত্র হইত। ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরার যে যে অংশ ঢাকার

সন্নিহিত, সেই সেই অংশও বস্ত্রশিল্পে ও কার্পাসচাষে ঢাকার সহযোগিতা করিত। ঢাকা, সোনারগাঁ, ডুমরাই, তিনবাদী, মঙ্গলবাড়ী এবং বাজিতপুর, তুলার প্রধান আড়ঙ বলিয়া পরিচিত ছিল। এরূপ তুলার আড়ং বঙ্গের চারিদিকে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বঙ্গের নানাস্থানেই পূর্ব্বে বস্ত্রশিল্পের আধিপত্য ছিল, নানাস্থানেই কার্পাসচাষের প্রাদুর্ভাব ছিল; নানাস্থানেই তুলার গঞ্জ হাটও প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন ভারতের তুলায় ভারতের বস্ত্র প্রস্তুত হইত, বঙ্গের তুলায় বঙ্গের সরু মোটা মাঝারী সর্ব্ববিধ বস্ত্রই প্রস্তুত হইত। যাহা তখন হইত, তাহা এখনও হইতে পারে। কার্পাসচাষের উন্নতি বিস্তৃতি হইলেই, বঙ্গের তুলাভাব বিদূরিত হইবে। আবার পূর্ব্বের মত টাকু চরকার চলন হইলে, বঙ্গের তুলায় বঙ্গীয় বস্ত্রের সূত্র যথেষ্টপরিমাণেই প্রস্তুত হইবে। পথ প্রদর্শিত হইয়াছে, টাকু ও চরকা নানাস্থানে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁতীর তাঁত অনেক স্থানেই নবজীবন পাইয়াছে।

তুলা ও সূতা।

তুলা-তোলা, তুলা-ঝড়া, তুলা-আঁচড়ান, তুলা-পেঁজা, তুলার পাঁজ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি সমস্ত পূর্ব্বতন প্রক্রিয়া যদি নির্দ্দোষ না হয়, তাহা হইলে, সূতায় দোষ পড়ে। সূতায় দোষ পড়িলেই, কাপড়ে দোষ ধরে। অতএব, তুলাঘটিত সর্ব্বকার্য্যেই দক্ষতালাভ করা একান্ত আবশ্যক। গুল্ম-কার্পাস বৎসরে দুইবার তুলা দেয়; একবার দেয় বৈশাখ মাসে, আর একবার দেয় কার্ত্তিক মাসে। পাখীর যেরূপ বৈশাখী বাচ্ছাই সুস্থ সবল সুন্দর হয়, কার্পাসেরও সেইরূপ বৈশাখী তুলাই সুন্দর সূক্ষ্ম এবং উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈশাখী তুলার বীজই উৎকৃষ্ট; এই জন্য বৈশাখী বীজ যত্ন-

পূর্ব্বক রাখিতে হয়। কলসীর ভিতর ঘৃত বা তৈল মাখাইয়া, পরে তাহাতে কার্পাসবীজ রাখিতে হয়। অনন্তর বীজপূর্ণ কলসের মুখবন্ধ করিয়া, কলস ঘরের আড়ায়, আল্‌নায় বা দাওায় ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। পাক-গৃহে সর্ব্বদাই অগ্নির তাপ থাকে, তুলকৃষকের বীজ-কলস রান্নাঘরেই রাখা উচিত।

কার্পাসের ফল, পাকিলেই, ফাটিতে থাকে। যখন দেখা যায়, ফল ফাটিতেছে, সেই সময়েই যত ফল গাছ হইতে তুলিয়া লইতে হয়। ফল তোলা হইলে, তাহার পাকড়া ছাড়াইতে হয়। পাকড়া ছাড়াইতে যথেষ্ট ধৈর্য্য অধ্যবসায় এবং কিঞ্চিৎ কৌশল আবশ্যক। যিনি অস্থির হইয়া তাড়াতাড়ি পাকড়া ছাড়াইতে যান, তাঁহার হাতে তুলা নষ্ট হয়। পাকড়া ছাড়াইবার পর যে তুলা বাহির হয়, তাহা বীজে মিশ্রিত থাকে।

পূর্ব্বে সকলেই হাতে করিয়া, তুলার বীজ বাছিয়া ফেলিত। এখন এদেশের নানাস্থানে বীজ ছাড়াইবার কল হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশেই এইরূপ "জিনিংকল" অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশের তুলা এই সকল কলে বীজবর্জ্জিত হইয়া, বিদেশে প্রেরিত হইতেছে; কতক কতক বীজবর্জ্জিত তুলা এদেশেও ব্যবহৃত হইতেছে। তুলার বীজ তৈল-কলে ও ঘানীতে মাড়িয়া তৈল বাহির করা হইতেছে। এ তৈল নানাকার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। সিঠা খলে গোমহিষাদির ভক্ষ্য প্রস্তুত হইতেছে; তাহাতে জমির সারও হইতেছে।

বীজবর্জ্জিত তুলা এক প্রকার যন্ত্রে আঁচড়াইয়া লওয়া হয়। পরে সেই তুলার পাঁজ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতেই সূতা কাটিতে হয়। এদেশেও এখন এই সমস্ত কার্য্য অনেক স্থলে কলে সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বে এ সকল কাজও লোকে হাতে করিত, এখনও অনেকস্থলে হাতেই এ কার্য্য

সম্পন্ন হইতেছে। ঢাকা অঞ্চলে পূর্ব্বে সূত্রকর ও সূত্রকরীরা, বোয়াল মাছের চোয়াল দিয়া, তুলা আঁচড়াইত। পরে আঁচড়ান তুলা সমতল মসৃণ তক্তার উপর রাখিয়া, বেলুন দিয়া, রুটীবেলার মত করিয়া, বেলিয়া লইত। অনন্তর ঐ তুলায় লম্বা লম্বা গোল গোল পাঁজ করিয়া, পাঁজগুলি কুঁচে মাছের ছালের ভিতর রাখিতে হইত। এইরূপে সুরক্ষিত হইলে, পাঁজগুলি ধুলি বালি বা ময়লায় নষ্ট হইতে পাইত না। সূত্রকর ও সূত্রকরীরা এই ছাল-ঢাকা পাঁজ লইয়াই, টাকু ও চরকায় সূতা কাটিত।

চতুর্থ অধ্যায়।

সূতা-কাটা।

বোয়াল-চোয়াল।

বোয়ালের চোয়ালে তুলা আঁচড়ান হইত। এই দেখুন, বোয়াল-চোয়াল। চোয়ালের ঘনসংবদ্ধ, সূক্ষ্ম অথচ শক্ত কাঁটাগুলিই চিরুণীর কাজ করিত। এখন লৌহনির্ম্মিত চিরুণী-কলে যে কার্য্য সহজে সুসম্পন্ন হয়, পূর্ব্বে বোয়াল চোয়ালেই সেই কার্য্য সম্পন্ন হইত।
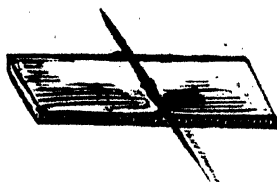
তূলা-বেলা।

ঐ যে, তূলা-বেলা যন্ত্র, উহা একখানি তক্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐ দেখুন, তক্তার উপর যে গোলাকার লম্বা দণ্ডটী পড়িয়া রহিয়াছে, উহাই তূলা-বেলা বেলুন। এখন এ সব কাজ কলে হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশের অল্পস্থানেই কল আছে, এইরূপ তক্তা-কলেই এখনও বেশ কাজ হইয়া থাকে। আবার ঐ যে,বেল্লন-ফলক, উহা যে সে কাষ্ঠে প্রস্তুত হয় না। চাল্‌তা গাছের তক্তা না হইলে, বেল্লন-ফলক ভাল হয় না। ঐ যে, বেলন-দণ্ড বা বেলন-শলাকা, ঐটী লৌহনির্ম্মিত। তূলা বেলিবার সময়ে ঐ বেলন-দণ্ড গড়াইয়া লইতে হয়। রুটী বেলিবার সময়ে যেরূপ বেলুন উপরে নীচে গড়াইতে হয়, তূলা বেলার সময়েও তূলার লৌহ-বেলুন ঠিক সেইরূপ উপরে নীচে গড়াইতে হয়। কৌশল চাই; তূলার অংশু বীজমুক্ত হইবে, কিন্তু বীজ আস্ত থাকিবে; এরূপ বেলন-কৌশল শিখিতে হয়। বিনা শিক্ষায়, বিনা অধ্যবসায়ে, কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না।

তূলা-ধোনা।

তূলা-বেলা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে, শিক্ষা ও কৌশল আবশ্যক। তূলা-ধোনাও নিতান্ত সহজ নহে।

"তুলার যেমন শুন্‌তে মজা
ধুন্‌তে লবেজান।"

এ কথা বলিবার সময়ে, সুন্দরের মালিনী মাসী প্রভৃত অভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছিলেন। কলিকাতার লোকে দেখিয়াছেন, হিন্দুস্থানী মুসলমান ধুনারীরা একটা একটা দীর্ঘপ্রস্থ বিকট যন্ত্র লইয়া, তুলা ধুনিয়া থাকে। আমাদের সূত্রকরীরা এরূপ বিকট যন্ত্রের ব্যবহার করেন না।

তুলা-ধোনা।

এই দেখুন, একটী সূত্রকরী কিরূপে তুলা-ধোনা কার্য্য সম্পন্ন করিতে-ছেন। ঐ দেখুন, ধুনয়িত্রীর হস্তে একগাছি ধনুক। ধনুকের নির্ম্মাণ-রহস্য দেখিবেন কি? অভিজ্ঞ কুশল কৃতকর্ম্মা লোকেই বলিতেছেন; "একটী সরল গোল সরু শক্ত ফাঁপা বাঁশের একটা পাবের দুই মুখে দুইগাছি সরু পাতলা স্থিতিস্থাপকতাযুক্ত বাখারী লাগাইতে হয়। বাখারীর যে মুখ বংশপর্ব্বের ভিতর সংলগ্ন থাকে, তাহাকে অবাধে বংশপর্ব্বমধ্যে বিচরণ করিতে হয়। এইরূপে প্রস্তুত ধনুকে ছিলা পরাইতে হয়। বেহালা সারঙ্গের জন্য যে তাঁত ব্যবহৃত হয়, জীব-জন্তুর অন্ত্রে প্রস্তুত সেই তাঁতেই ঐ ধনুকের ছিলা ভাল হয়। যাঁহারা বাল্যকালে

পল্লীগ্রামে থাকিয়া গুল্‌তি বাঁটুলের বা তীরের ধনুক লইয়া লক্ষ্যবেধ করিয়াছেন, বা যাঁহারা ঐ সকল ধনুক দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই তাঁতও দেখিয়াছেন। উৎকৃষ্ট বহুমূল্য বেহালার জন্য, ইউরোপের ইতালী প্রভৃতি রাজ্য হইতে যে তাঁত আসে, তাহা যত উৎকৃষ্ট, গুল্‌তি-ধনুক বা তীর-ধনুকের জন্য তত ভাল তাঁত আবশ্যক হয় না। ইউরোপের ঐ তাঁত পূর্ব্বে বিড়ালের অন্ত্রে প্রস্তুত হইত, এইরূপ প্রবাদ আছে। আর এই জন্যই ঐ তাঁত "ক্যাট-গট" বা "বিড়াল-তন্ত্র" বলিয়া পরিচিত। আমাদের গুল্‌তি-ধনুক বা তীর-ধনুকে, কিংবা তুলা-ধোনা ধনুকে যে তাঁত আবশ্যক হয়, তাহা এদেশের চর্ম্মকার মুচীরাই প্রস্তুত করে। ৪০।৫০ বৎসরের কথা বলিতেছি, তখন এই তাঁত হাটে হাটে বিক্রীত হইত। সূত্রকর সূত্রকরীরা, তুলা-ধনুকের জন্য, এই আঁতের তাঁত কিনিয়া লইয়া যাইত। বালক যুবকেরাও বাঁটুল, তীরের ধনুকের জন্য তাঁত কিনিত বটে, কিন্তু তুলনায় নাম মাত্র। মুচীদের ব্যবসায় চলিত, কেবল সূত্রকর সূত্রকরীদের জন্য ; বিশেষতঃ সূত্রকরীদের জন্য। বুঝিয়া দেখুন, তখনও সূত্রকার্য্যের কিরূপ প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি ছিল।

আর এক কথা। কেবল যে, তুলা-ধোনা ধনুকেই তাঁত ব্যবহৃত হইত, এরূপ নহে। সূতা-কাটা চরকা বা চক্রযন্ত্রেও তাঁত আবশ্যক হইত, এখনও হইয়া থাকে। এই চরকার কথা পরে কহিব, চরকার চিত্রও পরে দেখাইব। তুলা-ধোনার কাজ সারিয়া, টাকু ও চরকার কথা কহিব। আপাততঃ তুলা-ধোনাই আলোচ্য। এখন দেখুন, সূত্রকরীর হস্তে তুলা ধুনিত হইতেছে। ঐ দেখুন, সূত্রকরী ধনুকের তন্ত্রময়ী ছিলা, টানিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন, আর তাহারই আঘাতে আহত হইয়া, তুলা ক্রমে ক্রমে ফুলিয়া উঠিতেছে। অংশু পরস্পরসংযোগ হইতে বিযুক্ত হইয়া

শিথিল হইতেছে, কাজেই সংকুচিত তুল-রাশিও ক্রমেই বিস্ফারিত হইতেছে। বিস্ফারিত তুলা কোমল হইতেছে; কোমল তুলা পাঁজের উপযুক্ত হইতেছে! ধোনার পরও নানা প্রক্রিয়া আছে; প্রক্রিয়ার কথা পরে কহিতেছি। আপাততঃ

ধনুকের ছিলার কথায়

আর দুই এক কথা কহিতে বাধ্য হইতেছি। তুলা-ধোনা ধনুকে জীবজন্তুর অন্ত্র ব্যবহৃত হয়, শুনিয়া, যাঁহারা শিহরিয়া উঠিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা অভয় দিতেছি। প্রথমতঃ, শুষ্ক সংশোধিত চর্ম্ম বা অন্ত্র একান্ত অস্পৃশ্য নহে। যখন অব্যবহার্য্য শুষ্ক নীরস অস্থি অস্পৃশ্য নহে; যখন বসাদিময় অস্পৃশ্য অস্থ্যাদি স্পর্শ করিলেও, আচমনমাত্র প্রায়শ্চিত্ত; তখন ধনুকে অন্ত্র-নির্ম্মিত জ্যা দেখিলেও ত, ধর্ম্মভয়ে ভীত হইতে হয় না। আর যদিই, কোন উচ্চবংশীয় শুদ্ধাচার সূত্রকর বা সূত্রকরী, অন্ত্রতন্ত্রে একান্তই ভীত হন, তাহা হইলেও ত তাঁহার জন্য উপায়ান্তর আছে। ধনুকের ছিলা মূর্ব্বা বা মুগরার সূত্রে প্রস্তুত হয়। গুল্‌তি ও তীরের ধনুকেও যে, মুগরার ছিলা চড়াইলে চলে, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন; আমরা হাতে প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছি। যে কদলীসূত্রের "আবিষ্কার" করিয়া, এখন কত লোকে ধন্য হইতেছেন, সেই কদলী-সূত্রে আমাদের দেশে সর্ব্ববিধ ধনুকের ছিলা প্রস্তুত হইত, এখনও প্রস্তুত হইতে পারে। রেশমের ত কথাই নাই, রেশমের রজ্জু একান্ত দুশ্ছেদ্য; তাহাতে সকল ধনুকের উৎকৃষ্ট ছিলা প্রস্তুত হয়। তুলাধোনা ধনুকের ছিলা রেশমে উত্তমরূপই প্রস্তুত হইতে পারে; পূর্ব্বে প্রস্তুত হইত। যদি অন্ত্র-তন্ত্র, মূর্ব্বা, কৌষেয়সূত্রাদি কিছুই না পান,

তাহা হইলেও ভাবনা নাই। যার তোড়, তার যোড়, যার তলা, তার গলা, যার ধনু, তার ছিলা; পড়িয়াই আছে। যে বাঁশে ধনুক হইয়াছে, সেই বাঁশের বাখারী সরু করিয়া চাঁচিয়া লইলেই, ছিলার উপযুক্ত হইবে। পাকা বাঁশের খুব সরু বাখারী অতি শক্ত রজ্জুর কাজ করিয়া থাকে। পাইক সর্দ্দারদিগের ডাকাইতমারা তীর-ছোড়া বৃহৎ ধনুক যে পাকা বাঁশে প্রস্তুত হইত, সেই পাকা বাঁশের বাখারীতেই তাহার ছিলাও প্রস্তুত হইত। বাখারীর পর বেত্র। মলক্কাদ্বীপের সুন্দর বেত্র চিরিয়া ছুলিয়া চাঁচিয়া লইলে যে, সর্ব্ব ধনুকেরই উৎকৃষ্ট ছিলা প্রস্তুত হয়, তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। জ্যা-কার্য্যে আমাদের দেশীয় বেত্রও নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে। আবার পাটের না হউক, শণের দড়ীতেও ধনুকের ছিলা প্রস্তুত হয়, তুলা-ধোনা ধনুকের ছিলাও প্রস্তুত হয়। মসীনাগাছের ছোটার সূত্রই ছাল্‌টী বলিয়া পরিচিত। আমাদের দেশে এই ছাল্‌টী ক্ষুমা বলিয়া পরিচিত। ছাল্‌টীর কাপড় এই বিলাতের লিনেন, আমাদের ক্ষৌম। ক্ষৌম-সূত্র খুব শক্ত; ধনুর্জ্যা পক্ষে এই ক্ষৌমসূত্র অতীব উপযোগী। তুলা-ধোনা ধনুকেও ক্ষৌম-জ্যা বেশ চলিতে পারে।

ধোনার পর পাঁজ।

ধোনার পরও নানা প্রক্রিয়া আছে। ধনুর্জ্যার ঘন ঘন আঘাতে তুলা যখন কোমল হইয়া স্ফীত হইয়া থাকিবে; যখন এক ছটাক ধোনা তুলায় একটা মস্ত ঝোড়া পূর্ণ হইবে; তখনই দেখিবেন, তুলা ধোনা হইয়াছে। অতঃপর, ঐ ধোনা তুলা একটা কাষ্ঠময় স্থূল মসৃণ বেলন-দণ্ড বা বেলুনে জড়াইতে হইবে। জড়িত তুলা হইতে বেলুনটী

বাহির করিয়া লইয়া, সেই তুলা দুইখানি তেলা তক্তার মাঝে রাখিয়া চাপিতে হইবে। এইরূপে যেন তুলার পাটালী প্রস্তুত হইবে।

অনন্তর এই পাটালী বা তুলার রুটী একটী নলী বা গোলাকার ক্ষুদ্র দণ্ডের গায়ে জড়াইতে হইবে। সরু সুগোল কঞ্চীতে নলী প্রস্তুত হয়; গোলাকার কাষ্ঠশলাকা যদি গালায় আবৃত ও মসৃণ হয়, তাহা হইলেও, নলীর কার্য্য করিতে পারে। ছেলেদের লাটিম, শিশুদের চুষিকাটী, ঝুমঝুমী যেরূপ রঞ্জিত লাক্ষায় আবৃত হয়, ঐ নলীও সেইরূপে লাক্ষায় আবৃত হইতে পারে।

নলীতে জড়িত হইবার পর, গোলাকার দীর্ঘাকার তূলবর্ত্তিকা অতি যত্নে রাখিতে হয়। ধূলা মলা লাগিলে, তুলা খারাপ হইয়া যায়। খারাপ তূলায় ভাল সূতা প্রস্তুত হয় না। সুতরাং নলীজড়িত হইলে, বর্ত্তিকাকে আচ্ছাদন-মধ্যে রাখিতে হয়। উৎকৃষ্ট ঢাকাই-বস্ত্রের তূলবর্ত্তিকা বা পাঁজ কিরূপে আবৃত রক্ষিত হইত, জানেন কি?

কুঁচে-মাছের ছাল।

কুঁচে-মাছের ছালের ভিতর তূলবর্ত্তিকা রাখা উচিত। ঢাকাই সূত্রকর ও সূত্রকরীরা পূর্ব্বে রাখিতেন; এখন রাখেন কি না, বলিতে পারি না। কুঁচেমাছ অনেকেই দেখিয়াছেন। এই সর্পাকৃতি দীর্ঘমৎস্যের ত্বক্ যেরূপ মসৃণ, সেইরূপ শক্ত। ত্বক শক্ত অথচ কোমল; আবার রবারের ন্যায় স্থিতিস্থাপকতাযুক্ত। এই মাছের মাংস ও কাঁটা বাহির করিয়া ফেলিয়া, ছালটী আস্ত রাখিতে হয়। শুকাইয়া, পাট করিয়া, শূন্যগর্ভ ছালটীকে যেন একটী সরু ও লম্বা চর্ম্মাবরণে পরিণত করিতে হয়। কোমল তূলবর্ত্তিকা এই আবরণে রক্ষিত হইলে, কোমল শুভ্র নির্ম্মল ভাবে অবস্থিতি

করে। অনন্তর এই চর্ম্মাবৃত তূলবর্ত্তিকা হাতে লইয়াই, সূত্রকরী টাকু বা চরকার সাহায্যে, উৎকৃষ্ট অদৃষ্টপূর্ব্ব সূত্র প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

কাটনার ডালা।

এখনকার কলের কাণ্ড-কারখানা, যন্ত্র-তন্ত্র, তোড়জোড় দেখিলে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকেও বিস্মিত হইতে হয়; তন্তুবায়কুল-প্রতিষ্ঠাতা দেবতন্তুবায় শিবদাসকেও হতবুদ্ধি হইতে হয়। আমাদের সূত্রকরীরা যে "কাটনার ডালা" লইয়া, চক্ষুর অদৃশ্য অতিসূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিতেন, তাহা দেখিয়া কিন্তু বিলাতের ডাক্তার টেলর, ডাক্তার ইয়োর প্রভৃতি বিজ্ঞানবিশারদ শিল্পবিৎ পণ্ডিতদিগকেও বিস্ময়বিহ্বল হইতে হইয়াছিল। সূতা-কাটুনীর কাটনার ডালায় থাকে কতকগুলি তূলার পাঁজ, একটী পাথর-বাটী, এই বাটীতে কিঞ্চিৎ চা-খড়ীর গুঁড়া, একটী ক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ড, এই পিণ্ডগর্ভে সংলগ্ন একখানি ক্ষুদ্র শুক্তি বা ঝিনুক।

তূলবর্ত্তিকা বা পাঁজের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সাধারণ মোটা সূতার পাঁজ অনেকেই হয় ত দেখিয়াছেন; অদৃষ্টপূর্ব্ব ঢাকাই পাঁজ ঢাকা অঞ্চলের প্রাচীনেরা নিশ্চিতই দেখিয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টরের সূত্র-কলে সূত্রশিল্পীরা ৭০০ নম্বর সূতা প্রস্তুত করিয়া জগদ্বিজয়ী হইয়াছেন; আমাদের শিবদাস ও বিশ্বকর্ম্মাকেও পরাস্ত করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু ঢাকাই বস্ত্রের সূত্রে যাঁহারা পূর্ব্বে, হাতে টাকুতে কাটিতেন, তাঁহারা ১৫০০ নম্বর সূতা কাটিয়াও, কিছুমাত্র গর্ব্বিত হইতেন না। যে কাটনার ডালা ও কামিনীর কোমল হস্ত ঐরূপ সূতা প্রস্তুত করিত, তাহা দেখিয়া বিলাতের বৈজ্ঞানিক শিল্পীরা অগত্যা বিস্ময়বিহ্বল হইয়াছিলেন

কাটনার ডালার খড়ীর গুঁড়া কি কাজে লাগিত, জানেন কি? টাকু বা চরকা ঘূরাইতে ঘূরাইতে,যখন সূতা-কাটুনী রমণীর হাত ঘামিত, তখন তিনি ঐ খড়িচূর্ণে দুইটী আঙ্গুল একবার ঠেকাইয়া লইতেন। তাহা হইলেই, আঙ্গুলের ঘাম মরিয়া যাইত, সূতা-কাটা কাজও অবাধে চলিত। যাঁহারা সুদক্ষা, তাঁহাদের হাতে সূতা সুন্দর হইত, সূতা অধিক হইত, অথচ তাঁহাদের হাত শীঘ্র ঘামিত না। শিক্ষানবীশ আনাড়ীর হাত ঘন ঘন ঘামিত, সে সূতাও কাটিতে পারিত না, কেবল খড়ী নষ্ট করিত। এই জন্য প্রবীণা সুদক্ষা সূত্রকরীরাই বলিয়া গিয়াছেন;

"কু-কাটুনী খড়ী খাবার রাক্কস।"

অদক্ষ শিল্পী শিল্পিনীরা হিতে কেবল বিপরীত করে আবার যন্ত্র-তন্ত্রের ঘাড়েই সব দোষ চাপাইয়া দেয়। এই জইন্য ত প্রবাদ আছে,

"নাচ্‌তে না জান্‌লেই আসরের দোষ।"

ইংরেজের প্রবচনেও আছে,"আনাড়ী শিল্পীই যন্ত্রের সহিত বিবাদ করে।"

যে "কাটনার ডালাকে" অজ্ঞ লোকে "ডেয়ো ঢাক্‌নার" সামিল করিয়া, অগ্রাহ্যের তলে ফেলিয়া দেয়; পাশ্চাত্য গর্ব্বিত শিল্পীরা যাহাকে "ছেলের খেলা" বলিয়া মনে করিতেন; সেই ডালার উপযোগিতা দেখিয়া, ডাক্তার টেলর ও ডাক্তার ইয়োরের ন্যায় অদ্বিতীয় শিল্পবিশারদ বৈজ্ঞানিকদিগকে সহস্রমুখে প্রশংসা করিতে হইয়াছিল। চরকার কথা পরে কহিব। যে টাকুর আকার-প্রকারে আর কার্য্যকৌশলে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে প্রথমে ভাবচক্রে পড়িতে হইয়াছিল, পরে যাহার উপযোগিতা দেখিয়া, তাঁহাদিগকে বিস্ময়সাগরে ডুবিতে হইয়াছিল, সেই টাকুর কথাই আমরা প্রথমে কহিব।

পঞ্চম অধ্যায়।

তর্কু বা টাকু।

তর্কু ভারতের চিরন্তন সূত্র-যন্ত্র। দেব-তন্তুবায়, তন্তুবায়-সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ শিবদাস যখন, দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপায় আবির্ভূত হইয়া, বস্ত্রবয়নে প্রবৃত্ত হন, সে সময়ে বিশ্বকর্ম্মা প্রথমে চক্রযন্ত্র বা চরকার উদ্ভাবনা ও নিম্মাণ করিয়াছিলেন। চরকার মোটা সূতায় ব্রহ্মা-ব্রহ্মাণী ও শিব-শিবানীর মোটা কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল; সেই কাপড়েই শিবানী ব্রহ্মাণী তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু যে বিষ্ণুবনিতা লক্ষ্মীর জন্যই বস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল; দেবভোজনের পরিবেশন উপলক্ষে পরিধেয়-বল্কল কটিচ্যুত হইয়া, যাঁহাকে বিবসনা করিয়াছিল; তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন,

"যদি এরূপ মোটা কাপড় পরিতে হয়, তাহা হইলে, আমি বরং বল্কল পরিয়াই লজ্জানিবারণ করিব।"

বিষ্ণু নিজেও বাবু ছিলেন। দেবতা-বাবু বলিলেন, "আমি এ মোটা কাপড় লক্ষ্মীকে পরাইব না, নিজেও পরিব না।"

শিবদাসের মোটা কাপড় দেখিয়া, দেবরাজ হাসিয়াই হতবুদ্ধি হইলেন। তাঁহার শচী সাড়ীখানা লইয়া, মহাদেবের ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিলেন। মহাদেব হাসিয়া বলিলেন, "আমার যখন আদৌ কোনরূপ বস্ত্র আবশ্যক হয় না, তখন আমার পক্ষে সরু মোটার তারতম্য নাই।" কিন্তু শচীর হস্তে মোটা কাপড়কে বর্জ্জিত হইতে দেখিয়া, মহাদেবের

মহাদেবীও সুর ফিরাইয়া বলিলেন, "স্বঘরে—নিজের বিদ্যাশ্রমে যাহা তাহা পরিতে পারি ; লক্ষ্মী বা শচীর ঘরে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার সময়ে ত এ মোটা কাপড় পরিতে পারিব না।"

উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি যত অপ্সরাই একবাক্যে বলিলেন ; "আমরা দেবসভায় বিবসনা হইয়া আসিব, নাচিব ; তথাপি এ মোটা কাপড় পরিব না। এ কর্কশ-বস্ত্রে আমাদের কোমল অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইবে।" বালক গণপতি বলিলেন, "কাপড় আবার সরু মোটা কি ? যাহাতে অঙ্গ আবৃত হয়, তাহাই বস্ত্র।" কার্ত্তিক বলিলেন, "দাদার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই ; তাঁহার ধড়টাই দেবতার মত, মুখটি যে, সাক্ষাৎ গজমুখ। গজমুখে গজকর্ণ, গজমুখে গজনেত্র, তাঁহার ক্ষুদ্র গজনেত্রে সরু মোটা সব সমান। আর মুখেঁ যে, দুইটা ভয়ঙ্কর গজদন্ত ! দেব-বালিকাদের ত কথাই নাই, কোন দেববালকও ভয়ে তাঁহার কাছে যায় না। তাঁহার কাছে সরু মোটার তারতম্য থাকিবে কেন ? আমি বাবার বাবু-ছেলে, দেববালিকাদের সঙ্গেই আমাকে দিন রাত খেলা-ধূলা করিতে হয়, আমি এ মোটা কাপড় পরিব না। ইন্দ্রের জয়ন্ত যে কাপড় পরিবে, আমিও সেই কাপড় পরিব। শচী যদি মোটা কাপড় না পরেন, তাহা হইলে, আমার জননীই বা কেন পরিবেন ?"

বিভ্রাট দেখিয়া, মহেশ আবার বিশ্বকর্ম্মার দিকে চাহিলেন ; বিশ্ব-কর্ম্মাও চরকা রাখিয়া, টাকু গড়িতে বসিলেন। প্রথমে পাথর ও মাটির চাকৃতি গড়িয়া, তাহাতেই বাখারীর শলা বসাইয়া, বিশ্বকর্ম্মা তর্কু প্রস্তুত করিলেন। এ টাকুতেও মিহি সূতা প্রস্তুত হইল না। তখন তিনি একটী সূক্ষ্ম তর্কু প্রস্তুত করিলেন ; সেই টাকুতেই পরে ঢাকাই সূতা প্রস্তুত হইতে লাগিল। অন্যান্য স্থানের সূত্রকরীরাও এই ঢাকাই টাকু লই-

রাই, সূতা করিতে আরম্ভ করিলেন ; এখনও সর্ব্বত্র এই টাকুতেই মিহি সূতা প্রস্তুত হয়। পাঠক দেখুন, এই এক সূত্রকরী সূক্ষ্ম তর্কুযন্ত্রে সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিতেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

তর্কুযন্ত্রে—সূক্ষ্মসূত্র।

টাকুতে সূতা-কাটা।

এই দেখুন, সূত্রকরী সূতা কাটিতেছেন। কাটনার ডালার জিনিসগুলি আপনারা পূর্ব্বেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। ঐ দেখুন, সূত্রকরীর দক্ষিণহস্তে টাকু ঘুরিতেছে। ঐ দেখুন, মৃৎপিণ্ডস্থ শুক্তিখণ্ডের উপর টাকুর মূল দণ্ডাগ্র অবস্থিত হইয়া, ঘুরিতেছে। সূত্রকরী দক্ষিণহস্তে তর্কু দণ্ড এবং বামহস্তে তুলবর্ত্তিকা ধরিয়া রহিয়াছেন। ঘূর্ণ্যমান তর্কুযন্ত্রের মুখ হইতে অনবরত সূত্র নির্গত হইতেছে, সেই সূত্র একটু দীর্ঘ হইলেই, সূত্রকরী কর্ত্তৃক দক্ষিণহস্তের তর্কুদণ্ডে জড়িত হইতেছে। এইরূপে ক্রমশঃ তর্কু সূত্রপ্রসব করিতেছে ; আবার ঐ প্রসূত সূত্র নিজের অঙ্গেই জড়াইয়া লইতেছে।

এই সূক্ষ্মসূত্রপ্রদ তর্কুযন্ত্র নিজেও স্থূল নহে, বরং সূক্ষ্ম। দেখুন, তর্কুযন্ত্রের আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ।

টাকুর সূক্ষ্মদণ্ড বা শলাকাটি দেখিতে একটি দীর্ঘ স্থূল সূচিকাবৎ। সচরাচর এই শলাকা লৌহে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম অঞ্চলে সূক্ষ্ম বংশশলাকাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাকা তলদা বাঁশের বাখারী কৌশল-পূর্ব্বক চাঁচিয়া, সূত্রকর বা সূত্রকরী নিজেই এই শলাকা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। পাঠক দেখিলেন, আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পে বংশই মুখ্য অবলম্বন। মিহি মোটা সকল সূত্র-যন্ত্রে বংশ-নির্ম্মিত নানাবিধ উপকরণ আবশ্যক। ইউরোপে লৌহ কাষ্ঠ না হইলে, কোন কাজ হয় না। চীন জাপানের ন্যায় ভারতেও বংশেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। এখন টাকুর দিকে দৃষ্টি রাখুন। টাকুর লৌহশলাকাই হউক বা বংশশলাকাই হউক, উহার পরিধি একটা স্থূল সূচিকার অপেক্ষা অধিক হয় না; দীর্ঘেও ঐ শলাকা ১২ ইঞ্চির কম হয় না, ১৪ ইঞ্চির অধিক হয় না। এই শলাকার গোড়ার দিকে একটী মৃণ্ময় ক্ষুদ্র বর্ত্তুল সংলগ্ন থাকে। বর্ত্তুলের মধ্যস্থলে যে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে, শলাকাটি তাহার ভিতর চালাইয়া দিতে হয়। এরূপে বর্ত্তুলে শলাকা আঁটিতে হয়, যাহাতে বর্ত্তুল কোনরূপে শিথিল হইতে না পারে। মৃণ্ময় বর্ত্তুল কাঁচা থাকে, অনলে দগ্ধ হয় না। কাঁচা বাটুল শলাকা-বিদ্ধ হইয়া শুখাইয়া যায়, সুতরাং শলাকা আর সহজে শিথিল হইতে পায় না। বর্ত্তুলের আয়তন একটী মটরের মত। সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্ম—অতি সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিতে হয় বলিয়াই, বর্ত্তুল এরূপ ক্ষুদ্র করিতে হয়; শলাকাও এইজন্য সূক্ষ্ম করিতে হয়। প্রস্তর-চক্রযুক্ত স্থূল শলাকার তর্কুযন্ত্রে সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করা চলে না। কেন না, টাকুর ভার সুকুমার সূত্র সহ করিতে পারে না, কেবলই ছিঁড়িয়া যায়।

তর্কুর লঘুতা গুরুতা অনুসারেই সূত্রের সূক্ষ্মতা স্থূলতা হইয়া থাকে। সকলেই দেখিয়াছেন, পাট-কাটা ঢেরা বা টাকু একটা স্থূল যন্ত্র, তাহার ভারও কিছু অধিক। মোটা সূতা যে চক্রযন্ত্র বা চরকায় প্রস্তুত হয়, তাহাও যে, একটা জবড়জঙ্গ যন্ত্র,তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন ; আমরাও তাহা পরে দেখাইব। মোটা সূতার টাকুও স্থূল যন্ত্র, সে তর্কুযন্ত্রের বর্ত্তুল বড়। তাহাতে পাথরের চাকৃতীও লাগান হইয়া থাকে, তাহার শলাকাও কিছু মোটা। জালিকেরা, জালের জন্য,এইরূপ বড় টাকুতেই সূতা পাকাইয়া লয়। জালিকের টাকু ও সূতা-পাকানো, কলিকাতার লোকেও দেখিতে পান। কারণ, জালিকেরা প্রায়ই নিষ্কর্ম্মা থাকে না। জালের জন্য সূতা প্রস্তুত করা,তাহাদের নিত্যকার্য্য। এই জন্যই, তাহারা যেখানে থাকে, সেইখানেই টাকু চালায়। পথে চলিবার সময়েও তাহাদের টাকু কামাই যায় না। চলিতে চরণ চলে, টাকুতে হাতও চলে। জালিক যাইতে যাইতে যখন নিজের দক্ষিণ উরুতে গড়াইয়া দিয়া, টাকু ছাড়িয়া দেয়, তখন তাহার হাতে টাকু কেমন বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে থাকে, ঘুরিতে ঘুরিতে কেমন সূতা পাকাইতে থাকে, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহাকেই মুগ্ধ হইতে হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়।

সূতা-কাটার রহস্য।

সূক্ষ্ম সূত্র সর্ব্বত্র সকল সময়ে প্রস্তুত হয় না। যেখানে বায়ু কিঞ্চিৎ জলসিক্ত থাকে, যেখানে তাপ ৮২ ডিগ্রীর অধিক না হয়,সেইরূপ স্থলেই

সরু সূতা কাটিতে হয়। অতিতাপযুক্ত শুষ্ক বাতাসে সরু সূতা কাটিতে গেলে, খাই ক্রমাগত ছিঁড়িতে থাকে। বিলাতেই দেখিবে, লঙ্কাশায়রে যেরূপ জলবায়ু পাওয়া যায়, অন্যত্র ঠিক সেরূপ পাওয়া সুকঠিন। এই জন্যই লঙ্কাশায়রে যেরূপ সরু সূতা সহজে প্রস্তুত হয়, অন্যত্র সেরূপ সরু সূতা প্রস্তুত করা সহজ নহে। এ পক্ষে মেঞ্চেষ্টারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই জন্যই মেঞ্চেষ্টার সূক্ষ্ম-সূত্রের প্রধান সৃষ্টিস্থান। কিন্তু কলের সাহায্যে বাতাসের তাপ ও জলীয় বাষ্প ঠিক রাখা কঠিন হয় না; বিলাতে কলের সাহায্যে জলবায়ুকে সূক্ষ্ম সূত্রের উপযোগী করিয়া রাখা চলে। ভারতেও বোম্বাই অঞ্চলের বায়ু সর্ব্বদাই সাগরসলিলকণায় সিক্ত, তাপও সে অঞ্চলে সাধারণতঃ ৮২ ডিগ্রীর অধিক হয় না; বোম্বাই অঞ্চলের কলেও তাপ-শৈত্যের সামঞ্জস্য রাখা চলে। সুতরাং বোম্বাই অঞ্চলে সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করা কঠিন নহে। আমাদের বঙ্গের যাঁহারা চরকা টাকুর সাহায্যে হাতে সরু সূতা কাটিতে চান, তাঁহাদিগকে জলবায়ুর জন্য অসুবিধা-ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এ পক্ষেও, কৌশল জানিলে, সমস্ত বাধা বিঘ্নের অতিক্রম করা চলে। যাঁহারা সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করেন, তাঁহারা কৌশল জানেন। পূর্ব্বে ঢাকা অঞ্চলের সূত্রকরীরা যেরূপ কৌশলের প্রয়োগ করিতেন, তাহা অতি সহজ।

একটা ঈষৎগভীর বড় পাথর বা তদ্বৎ মৃৎপাত্র শীতল জলে পূর্ণ করিয়া, ঐ পাত্রের উপর টাকু ঘুরাইলে, সূক্ষ্ম সূত্র সহজেই প্রস্তুত হয়। পাত্রস্থ জলের জন্য তাহার উপরিস্থ ও পার্শ্ববর্ত্তী বাতাস জলীয় বাষ্পে সিক্ত থাকে, সুতরাং বায়ুর তাপও কম থাকে। যখন পাত্রের জল ক্রমে উষ্ণ হইয়া যায়, তখন সেই জল ফেলিয়া দিয়া, পাত্র আবার শীতল জলে পূর্ণ করিতে হয়। এইরূপেই বায়ুর তাপ ৮২ ডিগ্রীতেই রাখা চলে;

এইরূপেই বায়ুকে সিক্ত করিয়া রাখাও কঠিন হয় না। বিনা বিজ্ঞানে বঙ্গের সূত্রকরীরা, এইরূপ বৈজ্ঞানিক কৌশলে সুদক্ষ ছিলেন; ঢাকা অঞ্চলের সূত্রকরীরা এইরূপ কৌশলেই চক্ষুর অদৃশ্য সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিতেন। এখনও যে,তাঁহারা এইরূপ কৌশলের সাহায্য লইতে পারেন না, এরূপ নহে। সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিবার জন্য, সূত্রকরীদিগকে সময়ের উপরও নির্ভর করিতে হয়।

সূত্রের সময়।

ঊষাকালে আরম্ভ করিয়া, বেলা নয়টা পর্য্যন্ত; অনন্তর বেলা ৩টায় আরম্ভ করিয়া, সূর্য্যাস্তের এক দণ্ড পূর্ব্ব পর্য্যন্ত; দিবসের এই দুই অংশই সূক্ষ্ম সূত্রের উপযুক্ত কাল। ঋতুভেদে কিঞ্চিৎ তারতম্য হইলেও, এই দুই সময়েই সাধারণতঃ সরু সূতা কাটা চলে। কেন না, বায়ুর সিক্ততা ও শৈত্য এই দুই সময়েই সুসূক্ষ্ম সূত্রের উপযুক্ত থাকে। ঢাকার সূত্রকরীরা এই দুই সময়েই সরু সূতা প্রস্তুত করিতেন। কিন্তু যাহাতে ঢাকার "আব্‌রোঁয়া" "পরুরোঁয়া" প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্ম "মস্‌লিন" বা মলমল প্রস্তুত হইত, সে সূক্ষ্মতম সূত্র ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ের সর্ব্বভাগে প্রস্তুত হইত না। সেরূপ সূতার জন্য সুদক্ষ সূত্রকরীরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কার্য্যারম্ভ করিতেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘাসের শিশির শুখাইয়া না যাইত, তাঁহারা ততক্ষণ কাজ চালাইতেন। এই স্বল্পক্ষণের মধ্যে যে সূত্র প্রস্তুত হইত, তাহা সত্য সত্যই চক্ষুর অদৃশ্য হইয়া থাকিত। কিন্তু উপরেই বলিয়াছি, সূত্রকরীরা শীতলজলপূর্ণ পাত্রের সাহায্যে, সূতা-কাটার নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলেও, অতিসূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন; প্রস্তুতও সকলেই করিতেন। যাহা তখন হইত, তাহা এখনও হইতে পারে। যাহাতে হয়, তাহারই ত ব্যবস্থা করা উচিত।

সূত্রের সূক্ষ্মতা।

যে সূত্রের ১৪০ হাতে ১ রতি হয়, সেই সূতাই সাধারণ মলমলের পক্ষে সূক্ষ্ম বলিয়া গ্রাহ্য হইত। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ-ভবনে যে মলমল যাইত, তাহার সূতার ১৫০ হাতেই রতি হইত। আবার সময়ে সময়ে, যাহার ১৬০ হাতে এক রতি হয়, এরূপ সূতাও বাদশাহী বস্ত্রে ব্যবহৃত হইত। পরন্তু বাদশাহবংশের যে সকল বিলাসিনী—আরও সূক্ষ্ম—অদৃশ্য-প্রায় বস্ত্র না পাইলে, তৃপ্ত হইতেন না, তাঁহাদের জন্য ঢাকার শিবদাস-বংশধরদিগকে আরও সূক্ষ্ম সূতা লইতে হইত। তাঁহাদিগকে যে সূতায় কাপড় বুনিতে হইত, তাহার ১৭৫ হাতে ১ রতি হইত। এই অতিসূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক সূত্র কেবল সোণারঙ্গের হিন্দুসূত্রকরীরাই প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের পরে কিন্তু এরূপ মহাসূক্ষ্ম সূত্র দুর্ল্লভ হইয়াছিল। কারণ, তখন দিল্লীর বাদশাহবংশ দুঃস্থ হইয়া পড়িয়াছিল; ফরাসি-রাজ্যের বুর্ব্বোঁ বংশকেও তখন রসাতলে যাইতে হইয়াছিল। তখন ফরাসিরাজ্য বিপ্লবে অভিভূত হইয়াছিল, ফরাসিরাজ্যের বিলাসী বিলা-সিনীদিগকে বিলাস ভুলিয়া প্রাণের জন্য বিব্রত হইতে হইয়াছিল। কাজেই ১৮০০ অব্দের পর ফরাসিরাজ্যের জন্যও আর ঢাকাই বস্ত্রীদিগকে অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইত না। ফরাসিবৎ সূক্ষ্মবিলাস বিলাতে কোনকালে ছিল না। স্কটলণ্ডের ত কথাই নাই, ইংলণ্ডের বিলাসও, ফরাসির তুলনায়, স্থূলবিলাস। বিলাতের স্থূলবিলাসিনীরা ঢাকার জগদ্-বিখ্যাত মলমল অঙ্গে দিতেন না। ফরাসিরাজ ষোড়শ লুইয়ের রাজপরি-বারে যে মস্‌লিন নিত্য ব্যবহার্য্য ছিল, সে মস্‌লিন বিলাতে যাইত না।

আর ভারতেশ্বরের পরিবারবর্গ স্বরাজ্যের সেরূপ বস্ত্র দেখিয়া তুষ্ট হইতেন, কিন্তু পরিতে উৎসুক হইতেন না।

ভগ্নাবস্থায়ও ঢাকা, যেরূপ দেবদুর্ল্লভ অপ্সরাভিলষিত বস্ত্র দিতে পারিত, তাহার সূক্ষ্মতা দেখিয়া, বিলাতের তন্তুবায়দিগকে বিস্ময়-বিহ্বল হইতে হইয়াছিল। বিলাতের কলের জন্য, বঙ্গের তাঁতকে ১৮৪৬ অব্দেও বিকল হইতে হইয়াছিল। ১৭৯৫ অব্দ হইতেই যে, বিলাতের কাপড়-কল ভারতকে বস্ত্র যোগাইবার জন্য, ভারতের তাঁতকে বিকল করিতে-ছিল; বঙ্গের তন্তুবায়কুলকে নির্ম্মূল করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; ভারতের ইংরেজ রাজপুরুষেরাও যে, ভারতের বস্ত্রশিল্পকে গলা টিপিয়া মারিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; বঙ্গের রাজপুরুষেরা যে, স্বহস্তার্জ্জিত অমৃত-বৃক্ষসমূহের ছেদ করিয়াছিলেন, তাহা এখন আর কাহারই অবিদিত নাই। সুতরাং ১৮৪৬ অব্দে যে, বঙ্গীয় বস্ত্রশিল্পের অবনতি হইয়াছিল; ঢাকাই বস্ত্রশিল্পেরও যে, দুর্দ্দশা হইয়াছিল; তাহা সকলেরই বিদিত আছে। তথাপি ঐ ১৮৪৬ অব্দে ঢাকাই বস্ত্রের জন্য যে সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত হইত, তাহার

এক সের ৫০০ মাইল

অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ হইত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দেও বিলাতের জ্ঞানদৃপ্ত শিল্পীরা এইরূপ সূত্র ও এই সূত্রের বস্ত্র দেখিয়া, লজ্জায় অধোবদন হইয়াছিলেন। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া দেবীর স্বামী প্রিন্স এল্‌বার্টের যত্নে ও চেষ্টায় লণ্ডনে যে প্রদর্শনী বসিয়াছিল, সেই প্রদর্শনীর জন্য, ১৮৫০ অব্দে, ঢাকার বস্ত্র সূত্র প্রেরিত হইয়াছিল। বস্ত্র সূত্র দেখিয়া, বিলাতের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই বিস্ময়সাগরে ডুবিতে হইয়াছিল। এই-রূপ সূত্র দেখিয়াই, ডাক্তার টেলর বলিয়াছিলেন,

"হিন্দুসূত্রকরীরা কেবল কোমল-করাঙ্গুলিস্পর্শে যে সূত্র প্রস্তুত করেন, সে সূত্র অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে হয়, চর্ম্মচক্ষে তাহার উপলব্ধি হয় না। এই হস্তাঙ্গুলিনির্ম্মিত অদৃশ্য সূত্র যেরূপ সর্ব্বাঙ্গে সমান সুগোল হয়, এরূপ সুগোল সমাঙ্গ সূক্ষ্ম সূত্র মেঞ্চেষ্টারের সুদক্ষ শিল্পীরা, অসংখ্যযন্ত্রযুক্ত অসংখ্যচক্রসমন্বিত বিচিত্র বিজ্ঞানপ্রসূত মহাযন্ত্রেও, প্রস্তুত করিতে পারেন না।"

ঢাকাই সূত্রের সূক্ষ্মতা দেখিতে চান? চলুন বিলাতের বিখ্যাত শিল্পবিজ্ঞানবিৎ ডাক্তার ইয়োরের কাছে চলুন। তিনি নিজের জগদ্বিখ্যাত শিল্পকোষে বলিতেছেন,

"ঢাকার সূত্রকরীরা যে সূত্র প্রস্তুত করেন, তাহার ১৫০০ গাছি পাশাপাশি রাখিলে, এক ইঞ্চির অধিক হয় না।"

এই ১৫০০কে যদি ১৫০০ নম্বর বলিয়া ধরেন, তাহা হইলে, দেখিবেন, মেঞ্চেষ্টারের অদ্বিতীয় সূত্রযন্ত্রে যে ৭০০ নম্বরের সূতা প্রস্তুত হয়, তাহা ঢাকাই সূতার তুলনায় সূক্ষ্ম নহে, স্থূল—অতিস্থূল। আর বস্তুতও ঢাকাই সূত্র চক্ষে দেখা যায় না, মেঞ্চেষ্টার-সূত্র চক্ষে দেখা যায়। এত কৌশলকাণ্ডেও ত মেঞ্চেষ্টার এ পর্য্যন্ত ঢাকার মত "আবরোঁয়া" বা "পরোঁয়া" প্রস্তুত করিতে পারিলেন না! পাঠক,

ঢাকার কার্পাসেই

ঐরূপ ঢাকাই সূতা প্রস্তুত হইত; এইরূপ ঢাকাই সূত্রেই ঢাকাই মলমল প্রস্তুত হইত। ১৮১১ খৃষ্টাব্দেও ঢাকার বস্ত্র সূত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুরাগ ছিল। কারণ তখনও বিলাতের কলে কেবল মোটা কাপড়ই প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু ঐ সময়েই বিলাতের তন্তুবায়েরা মার্কিণ তুলার ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরিকায়

নানারূপ তূলা উৎপন্ন হয়। কিন্তু মেক্‌সিকো উপসাগরের তীরস্থ ভূভাগের মত উৎকৃষ্ট তূলা অন্যত্র হয় না। আবার নিকটবর্ত্তী অনেক দ্বীপে যেরূপ তূলা জন্মে, সেরূপ তূলা মেক্‌সিকো-তীরেও দুর্ল্লভ। আমরিকার "সী-আইল্যাণ্ড" তূলাই তূলার রাজা। দেখিতে পাই, মার্কিণ তূলা কার্পাস-গাছে হয়, কার্পাস-গুল্মেও উৎপন্ন হয়। গাছ-কার্পাসের তূলাতেই অংশু দীর্ঘ, গুল্ম-কার্পাসের তূলায় অংশু হ্রস্ব। আমরিকার ন্যায় বিলাতের কলেও দ্বিবিধ মার্কিণ-তূলাই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং হ্রস্বাংশু তূলায় যে, কলের কাপড় আদৌ প্রস্তুত হয় না, ইহা সত্য ও সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে। লম্বা আঁশের তূলায় কলের কাজ সহজে চলে, ইহা মানি; কিন্তু ছোট আঁশের তূলায় যে, কল আদৌ চলে না, ইহা মানি না। ভারতের হ্রস্বাংশু কার্পাসেও ভারতের কল চলে. এখনও না চলিতেছে, এরূপ নহে। তবে মিশরীয় ও মার্কিণ গাছ-কার্পাসের দীর্ঘাংশু তূলায় কাজ যেরূপ সহজ হয়, ভারতীয় খর্ব্বাংশু তূলায় সেরূপ সহজ হয় না। এই জন্যই ত আমরা বলিতেছি, যে কলে ভারতীয় তূলায় কাজ সহজ হয়, সেইরূপ কলই ভারতে বসান উচিত। ভারতের তূলাও অগ্রাহ্য নহে। কোন কোন অনভিজ্ঞ ভ্রান্ত লোকে মনে করেন, ভারতের তূলায় বিলাতের কলে কাপড় হয় না, দড়া দড়ি রসা রসি চট চটাই প্রস্তুত হয়। তাহা হইলে আর মার্কিণ গৃহযুদ্ধের সময়ে, ভারত হইতে প্রতিবৎসর ২৫।৩০ কোটি টাকার তূলা লুক্কাশায়রে যাইত না। তাহা হইলে, এখনও প্রতিবৎসর ১৫।২০ কোটি টাকার তূলা ভারত হইতে বিলাত যাইত না। ভারতীয় তূলাতেই ভারতীয় বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। আর ভারতেও গাছ-কার্পাস ও গুল্ম-কার্পাস—দ্বিবিধ কার্পাস জন্মে; গাছ-কার্পাসের তূলা স্বভাবতই দীর্ঘাংশু হইয়া থাকে। মেঞ্চেষ্টারের আদেশে এদেশে দ্বিবিধ

তুলারই উৎপত্তিবৃদ্ধি হইতেছে। যাহাতে ভারতের তুলাতেই বিলাতের কল চলিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা হইতেছে। বিলাতের কলে বৎসর ৮০।৯০ কোটি টাকার তূলা খরচ হয়; এখন আমরিকা হইতে ৬০ কোটি টাকার তুলা আসে, ভারত হইতে ২০ কোটি টাকার যায়। কিন্তু ১৮৬৪ অব্দে যখন মার্কিণ গৃহযুদ্ধের জন্য মার্কিণ তূলা অপ্রাপ্য হইয়াছিল, তখন ভারতে তূলার উৎপত্তি এক বৎসরেই দ্বিগুণিত হইয়াছিল। সেই জন্যই বিলাতের তন্তুবায়েরা বলিতেছেন, "ভারত হইতে যাহাতে শীঘ্রই অন্ততঃ ৪০।৫০ কোটি টাকার উৎকৃষ্ট তূলা পাই, তাহার ব্যবস্থা ভারতের গবর্ণমেণ্টকে করিতেই হইবে।" গবর্ণমেণ্টকে যে, করিতেই হইতেছে, তাহা আমরা সকলেই দেখিতেছি।

অষ্টম অধ্যায়।

বঙ্গীয় তূলার উৎকর্ষ।

১৭৮৯ অব্দেও যখন বঙ্গীয় বস্ত্রের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে লালায়িত থাকিতে হইয়াছিল, যখনও বঙ্গের চারিদিকে কোম্পানির কুঠী ছিল, যখনও কুঠীর ইংরেজ রাজপুরুষেরা চারিদিকের তন্তুবায়দিগকে দাদনে আবদ্ধ করিয়া প্রভূত বস্ত্রের সংগ্রহ করিতেন; যখনও বঙ্গীয় বস্ত্র পর্ব্বত বিলাতে গিয়া বিলাতের লোককে তুষ্ট করিত; তখনও সমগ্র বঙ্গের সর্ব্বত্র তাঁত চলিত, তাঁতীর তাঁতে তখনও সর্ব্বত্রই কাপড়ের পাহাড় প্রস্তুত হইত। তখনও বস্ত্রশিল্পে ঢাকাপ্রদেশ অদ্বিতীয় ছিল; তখনও ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নোয়াখালিকে, বস্ত্রবিষয়ে, ঢাকা-বিভাগের অন্তর্গত থাকিয়া, ঢাকা বলিয়া পরিচিত হইত। তখনকার ঢাকাই

কার্পাস সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে উৎপন্ন হইত। ঢাকা জেলার অন্তর্গত কাপাসীয়া আড়ঙ তুলার পর্ব্বতে সমাকীর্ণ হইত; তাই কাপাসীয়া নাম এখনও প্রচলিত এবং প্রসিদ্ধ।

তূলার উৎকর্ষে সূত্রের উৎকর্ষ।

বঙ্গীয় তূলা উৎকর্ষের জন্য এক সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল। বঙ্গীয় তূলার মধ্যে আবার ঢাকাই তূলাই শ্রেষ্ঠ ছিল। তখন তূলার উৎকর্ষেই সূত্রের উৎকর্ষ হইত। ১৭৮৯ অব্দেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কমার্শিয়াল রেসি-ডেণ্ট বা বাণিজ্য-সংসৃষ্ট রাজপুরুষদিগকে, ভারতের সর্ব্বত্র কুঠী করিয়া, আধিপত্য করিতে হইত। বঙ্গের নানাস্থানেও বণিক্ কোম্পানির বাণিজ্য-প্রতিনিধিদিগকে আধিপত্য করিতে হইত। প্রথমে স্বার্থের জন্য ইঁহা-দিগকে বঙ্গীয় বস্ত্রশিল্পে উৎসাহ দিতে হইয়াছিল। পরে যখন বিলাতের কলে প্রভূত কার্পাস-বস্ত্র প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল,যখন ভারতের বস্ত্র না লইয়া,কোম্পানি বিলাতের বস্ত্রই ভারতকে দিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন, তখন ঐ সকল বাণিজ্য-প্রতিনিধিদিগকে, স্থানীয় ইংরেজ-রাজপুরুষদিগের সাহায্যে, ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে আঘাত করিতে হইয়া-ছিল; বঙ্গীয় বস্ত্রশিল্পের মুণ্ডপাত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ১৭৮৯ অব্দে এরূপ মুণ্ডপাতের অবসর উপস্থিত হয় নাই। তখনও এতদ্দেশীয় বস্ত্রশিল্পে উৎসাহ দেওয়া এবং সাহায্য করাই, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিচিত ছিল।

ঐ ১৭৮৯ অব্দে ঢাকার কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট বেব সাহেব লিখিয়াছিলেন;

"ঢাকা অঞ্চলের সূত্রে যে, বস্ত্র অতি উৎকৃষ্ট হয়,তাহার হেতু আছে। ঢাকাই সূতার এই বিশিষ্ট গুণ যে, এই সূত্রে বপিত বস্ত্র কাচে-কাচে

মিহি হয়। কেন এরূপ হয়, তাহা সকলে জানেন না। আমি দেখিয়াছি, ঢাকাই সূতা কাচে-কাচে ফুলে না বলিয়াই, ঐ সূতার কাপড় যত পুরাতন হয়, ততই অধিক সূক্ষ্ম সুকুমার হয়। পক্ষান্তরে মেঞ্চেষ্টারের কলের সূতা কাচে-কাচে ফুলিয়া উঠে, তাই মেঞ্চেষ্টারের সূক্ষ্মবস্ত্রও কাচে-কাচে মোটা হইয়া পড়ে।"

বেব সাহেবের বিবরণেই দেখিতেছি, কেবল ঢাকার সূতায় নহে, সমস্ত বঙ্গীয় সূত্রেই এই গুণ বিদ্যমান ছিল। আবার, কেবল যে, টাকুর সরু সূতাই এই গুণে প্রসিদ্ধ ছিল, এরূপ নহে; টাকু ও চরকার মোটা সূতায়ও এই গুণ দৃষ্ট হইত। এদেশের হাতে-কাটা সমস্ত সূতাই কাচে-কাচে মিহি হইত। এখন এদেশে তাঁত যেরূপ চলিতেছে, টাকু চরকা সেরূপ চলিতেছে না; এখনও কলের সূতায় তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। কলের সূতা সর্ব্বত্র সমান; বিলাতী কলের সূতা যেরূপ কাচে ফুলে, ভারতীয় কলের সূতাও সেইরূপ কাচে ফুলে।

টাকু অনেকেই দেখিয়াছেন, পূর্ব্বে চিত্রেও টাকুর দর্শন পাইয়াছেন। আজকাল স্বদেশিপক্ষপাতের কল্যাণে চরকাও চারিদিকে দেখা দিতেছে। এই চক্রযন্ত্র শিবদাসের আমল হইতে চলিতেছে। এশিয়া ইউরোপের সর্ব্বত্র পূর্ব্বে চক্রযন্ত্র প্রচলিত ছিল। নবীন মার্কিণ-রাজ্যেও প্রাচীন ইউরোপের চক্রযন্ত্র গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য চরকায়, ও আমাদের গ্রাম্য চরকায়, বিলাতের চরকায় ও ভারতের চরকায় গঠনের কিঞ্চিৎ তারতম্য থাকিলেও, মূল প্রক্রিয়ায় তারতম্য নাই। আমাদের দেশের সাধারণ চক্রযন্ত্র বা চরকা কিরূপ, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন; কলিকাতার অনেকগুলি কারখানায় চরকা প্রস্তুত ও বিক্রীত হইতেছে। যাঁহারা আসল দেখেন নাই, তাঁহারা চিত্রে স্থূল নকল

দেখুন। টাকুর প্রধান উপাদান যে শলাকা, তাহা চরকায় আছে। টাকুতে বংশশলাকা চলে, চরকায় বংশশলাকা চলে না; লৌহ বা ইস্পাতের শলাকা ব্যবহৃত হয়, অন্যথা শলাকা ভাঙ্গিয়া যায়।

চরকা।
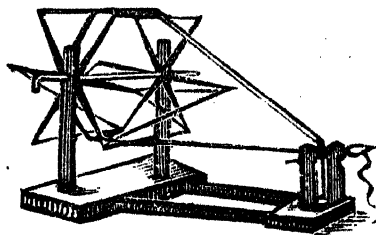
ঐ দেখুন, চরকা বা চক্রযন্ত্রের সম্মুখভাগে দুইটী ক্ষুদ্র খর্ব্ব সূক্ষ্ম স্তম্ভের উপর শলাকা থাকিয়া, তর্কু শলাকার কার্য্য করিতেছে। চক্রযন্ত্রের পশ্চাদ্ভাগে ঐ যে, গোলাকার দণ্ড, ঐটী ঘুরাইলেই, সম্মুখভাগের তর্কু-শলাকা ঘুরিতে থাকে। কারণ, অন্ত্র বা সূত্রে নির্ম্মিত তন্তু দ্বারায় ঐ ঘূরণদণ্ড এবং তর্কুযন্ত্র এরূপ ভাবে সংসৃষ্ট আছে যে, ঘূরণদণ্ড ঘুরিলেই, তর্কুশলাকা ঘুরিতেছে। সূত্রকরী এক হাতে ঘূরণদণ্ড ঘুরাইতে থাকেন, অন্য হস্তে তুলার পাঁজ চরকার তর্কুশলার মুখে লাগাইয়া, সূতা বাহির করিতে থাকেন। সূতা হাতের টাকুতে যেরূপ জড়াইয়া যায়, চরকার টাকুতেও সেরূপ জড়াইয়া যায়। ঘূরণের সাহায্যেই সর্ব্বকর্ম্ম সম্পন্ন হয়। হস্ত-তর্কু হাতের বেগে ঘুরে, এই চক্রতর্কুও হাতের বেগে ঘুরে। কিন্তু ঐ বেগ, ঘূরণ-দণ্ড হইতে তন্তু দিয়া, তর্কুশলাকায় উপস্থিত। সূত্রকরীর কৌশলেই কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। তিনি যত বেগে ঘূরণ-দণ্ড

ঘুরাইতে থাকেন তকু শলাকাও তত শীঘ্র ঘুরিতে থাকে; সুতরাং সূতাও তত শীঘ্র—তুলবর্ত্তিকা হইতে নির্গত হইতে থাকে। চক্রযন্ত্র অতি সুকৌশলে পরিচালিত করিতে হয়। চরকায় সূতা-কাটা যাহার তাহার কর্ম্ম নহে; বুদ্ধি চাই, শিক্ষা চাই, অধ্যবসায় চাই, সহিষ্ণুতা চাই। কুকাটুনীর কর্ম্ম নহে, কুকাটুনী কাজের কেহ নহেন, তিনি "খড়ী খাবার রাক্ষস।" চরকা চক্রযন্ত্র নানারূপ। এস্থলে যে চরকার চিত্র দেখান হইল, তাহাতে তাদৃশ গঠন-কৌশল নাই। জটিল-গঠন-কৌশল-যুক্ত চক্রযন্ত্র বা চরকা এখনও অনেক স্থলে আছে। কোন কোন হিন্দু-সূত্রকরী যেরূপ চরকায় কাটনা কাটিয়া থাকেন, কলিকাতার কোন কোন কারখানায় সেরূপ চরকাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

নবম অধ্যায়।

বস্ত্র-বয়ন।

কাপড়-বোনা যে, নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে; সুশিক্ষা না পাইলে যে, কেহই সুদক্ষ তন্তুবায় হইতে পারেন না; তাহা সকলেই জানেন। তন্তুবায়কে নানারূপ উপকরণ লইয়া কাজ করিতে হয়। তাঁতা, নাটাই, মালা, খুঁটা, শর, জুয়া, মাড়, সানা, দক্তি, শলা প্রভৃতি উনচল্লিশ যন্ত্র বা উপকরণ, বস্ত্রশিল্পে আবশ্যক হইয়া থাকে। নাটাই হইতে সূতা-নাটনী, টানা-দেওয়া বা টানা-সুতানা, সূতা-মোড়া, সূতা-বাতানী বা সূতার মাড়, সানা-বিন্না, টানায় শলাকা-স্থাপন,

গুটী-বাঁধা বা সূত্র-গ্রন্থি প্রভৃতি দশবিধ প্রক্রিয়া না হইলে, কাপড়-বোনা হয় না। বয়নকুশল তন্তুবায়দিগের পক্ষে শতার্দ্ধ প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার করা এবং দশবিধ প্রক্রিয়ার অবলম্বন করা কঠিন হয় না। শিক্ষা, অভ্যাস এবং অধ্যবসায়ের কল্যাণে, ইহারা সকল কার্য্যেই তৎপর। ইহাদের শতবিধ কার্য্য যেন স্বতই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষা-নবীশের পক্ষে প্রথমে যেন সমস্তই অসাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। দেখিলে, দর্শককে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইতে হয়। কেবল পুস্তকের উপদেশে শিক্ষা হয় না। সুদক্ষ শিক্ষাগুরুর কাছে, হাতে হাতিয়ারে শিখিতে হয়। পুস্তক সে পক্ষে সাহায্য করে। তন্তুবায়বংশের নর-নারী সকলেই,সকল কার্য্যে সকল কৌশলে সুদক্ষ। পুত্র-কন্যাদিগকে পিতা, মাতা, পিতৃব্য, পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতির কাছে শিক্ষা করিতে হয়। বধূরাও শ্বশ্রূ প্রভৃতির কাছে শিক্ষালাভ করেন। এখন বঙ্গের স্থানে স্থানে যে বয়ন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে শিক্ষকদিগের কাছে সর্ব্বজাতীয় ছাত্রেরাই শিক্ষালাভ করিতেছেন। কিন্তু যেরূপ সূক্ষ্ম, সুকুমার, বিচিত্র বস্ত্রশিল্পের জন্য ঢাকা, শান্তিপুর, অম্বিকা, ফরাসডাঙ্গা, কল্‌মে প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল, এখনও যেরূপ বিচিত্র শিল্পের জন্য ঐ সকল স্থান বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে, নবপ্রতিষ্ঠিত কোন বয়নবিদ্যালয়েই যে, সেরূপ শিল্প শিক্ষিত হইতেছে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। শুনিতেছি, কোন বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা ছয়মাসে বয়ন-শিক্ষা করেন, কোন বিদ্যালয়ের কোন কোন ছাত্র তিন মাসে শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু এ সব শিক্ষার কথা শুনিতে যেরূপ, কাজ দেখিতে সেরূপ নহে। কেবল প্রক্রিয়া প্রণালী শিখিলেই, শিক্ষা পূর্ণ হয় না। অনেক দিনের অকুণ্ঠিত অভ্যাস না হইলে, শিক্ষাই হয় না।

পুরাতন তাঁতেই হউক, আর নূতন তাঁতেই হউক, অক্ষুন্ন অভ্যাস আবশ্যক; ইহা যেন সকলের মনে থাকে।

সকল বিদ্যার ন্যায় বয়নবিদ্যায়ও পুস্তকের উপদেশ পথ দেখাইয়া দিবে; পুস্তকের উপদেশে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার পথ সহজে দেখিতে পাইবেন; শিক্ষাপথে সহজে প্রবেশও করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু সকলকেই হাতে যন্ত্রে, অধ্যবসায়-সহকারে অভ্যাস করিয়া, বয়নকার্য্যে সুদক্ষতালাভ করিতে হইবে। আমরা সংক্ষেপে স্বল্পকথায় পথ দেখাইয়া দিবারই চেষ্টা করিতে ছ ।

বস্ত্রবয়নের প্রথমে যে, সূত্র প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা পাঠক দেখিলেন। কিন্তু এই সূত্রকে বস্ত্রোপযোগী করিবার জন্য, প্রথমে নাটাই যন্ত্রে জড়াইতে হইবে। নাটাইযন্ত্রে সূত্র জড়াইতে হইলেও, কৌশল আবশ্যক। এই দেখুন চিত্র;—

নাটাইযন্ত্রে সূতা-জড়ান

বয়নে ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে সূত্র কিরূপে নাটাইযন্ত্রে জড়িত হয়, তাহা এই চিত্রে দেখিতে পাইতেছেন। কিন্তু জড়াইবার পূর্ব্বে কিছু কিছু

প্রক্রিয়া আবশ্যক। সূতা নলীতে থাকে, নলীশুদ্ধ জলে ভিজে। পরে একখানি চেরা বাখারীর চিরের ভিতর নলীটী রাখিতে হয়। ঐ বাখারী-খানি তন্তুবায়পুরুষ বা তন্তুবায়মহিলা,পা দিয়া চাপিয়া ধরেন। তিনি এক হাতে নাটাই ধরিয়া থাকেন। নাটাই-দণ্ড একটী নারিকেলের মালার উপর দাঁড়াইয়া থাকে। মালাটী চাঁচিয়া তেলা করিতে হয়, মালার অভ্যন্তর উত্তমরূপে মসৃণ করিয়া লইতে হয়। এইরূপ মসৃণ মালায় দাঁড়াইয়া নাটাই সহজেই ঘুরিতে থাকে। ঐ দেখুন, তন্তুবায়মহিলার এক হাতে নাটাই ঘুরিতেছে। নলীর সূতা নাটাইয়ে সংলগ্ন হইয়াছে। নাটাই যত ঘুরিতেছে, নলীর সূতাকে ততই টানিয়া টানিয়া, নিজের গায়ে জড়াইয়া লইতেছে। তন্তুবায়মহিলাকে অতি সন্তর্পণে সূতায় হাত দিয়া থাকিতে হইয়াছে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় সিক্তসূত্র বস্ত্রের উপযুক্ত হইতেছে। টানা পড়েন, উভয় অঙ্গের সূত্রকেই এই-রূপে সিক্ত হইতে হয়। কিন্তু টানার সূতা যে, বড় নাটাই হইতে অন্যরূপ ক্ষুদ্র নাটাইয়ে পুনর্জড়িত হয়,তাহা টানা-পাতার চিত্রে দেখিতে পাইবেন।

পড়েনের জন্যই সূক্ষ্মতর সূত্র রাখিতে হয়। সকলেই জানেন, বস্ত্রের দীর্ঘ সূত্রই টানা। কাপড় যত দীর্ঘ হয়, টানাও তত দীর্ঘ হইয়া থাকে। কিরূপ বস্ত্রে কত টানা দিতে হয়; তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্তুবায়-বংশের তাহা চিরন্তন জ্ঞান। বস্ত্রের প্রস্থদিকে, আদ্যন্ত যে সূতা ঘনীভূতভাবে সন্নিবেশিত হয়, তাহাকেই পড়েন বলে। কাপড়ের টানার উপর পড়িয়া থাকে বলিয়া, ইহাকে পড়েন বলে। এই পড়েনেই বস্ত্র প্রস্তুত হয়, টানা পড়েনকে ধরিয়া রাখে। পড়েনের সূতা যত মিহি হয়, বস্ত্র তত মিহি হয়; পড়েনের সূতা উৎকৃষ্ট হইলেই

কাপড়ও উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। টানা পড়েন, উভয় অঙ্গের সূতাই যে, ভিজাইতে হয়, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন।

টানার সূতা।

টানার সূতা তিন দিন জলে ভিজাইতে হয়। কিন্তু প্রত্যহ দুইবার করিয়া, তিন দিনে ছয়বার জল বদলাইতে হয়। চতুর্থ দিবসে সূতা নিংড়াইয়া নলীতে পরাইতে হয়। কিন্তু প্রথমে নলীতে জড়াইয়া,নলীশুদ্ধ সূতা ভিজাইলেও যে, তাদৃশ ক্ষতি হয় না, তাহা প্রথমে দেখাইয়াছি। নলীর সূতা কিরূপে নাটাইয়ে লইতে হয়, তাহাও উপরে দেখিয়াছেন। অনন্তর নাটাই হইতে লইয়া, সূতা আবার জলে ভিজাইতে হয়। ভিজাইয়া সূতা দুইটী কানিতে শক্ত করিয়া মোচড় দিয়া রাখিতে হয়। এই দেখুন, দুই জন তন্তুবায় এই কর্ম্ম কিরূপে সম্পন্ন করিতেছেন।

সূতা-মোচড়ান।

সূত্র কাটী অর্থাৎ শক্ত বংশশলাকায় এইরূপে সন্নিবেশিত হইয়া, আবার জলে সিক্ত হয়। কোরমাখান বা কালি-ভরা কাপড় দেখিয়াছেন,

অনেকে পরিয়াছেন। সচরাচর সূতার রঙেই কাপড়ের রং হয়। সুতরাং এইরূপ কাপড়ের সূতা যে জলে ভিজাইতে হয়, তাহাতে ভূষা মিশাইতে হয়। যে কাপড়ে কোর ভরা হয় না, তাহার সূতা শুদ্ধ জলেই সিক্ত হয়। জলে সূতা আবার দুই দিন ভিজে। তাহার পর সূতা, নিরাতপ স্থানে লম্বা লম্বা কাটীর উপর, শুখাইতে দেওয়া হয়। নিরাতপে শুষ্ক হইলে, সূতা আবার নলীতে থাকিয়া, আবার এক রাত্রি সিক্ত হয়। পরদিন খুলিয়া তক্তায় রাখিয়া, হাত দিয়া কৌশলপূর্ব্বক সূতা সমান করিয়া লইতে হয়। পরে এই সূতায় মাড় দিতে হয়।

মাড়ের কথা।

সূতায় খইয়ের মাড় লাগাইতে হয়। যাঁহারা বাল্যকালে ঘুঁড়ি উড়াইয়া, পেঁচ কাটা-কাটি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সূতার মাঞ্জা করিতে হইয়াছে। খইয়ের মাড়ে বোতলচুর বা কাঁচের অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ মিশাইয়া, তাহাতেই ঘুঁড়ির সূতার মাঞ্জা করিতে হয়। কাপড়ের সূতায়ও খইয়ের মাড় দিতে হয়, কিন্তু বোতলচূর্ণ দিতে হয় না। তবে, যে জলে খই গুলিয়া মাড় বাহির করিতে হয়, সেই জলে অত্যল্প চূণ দিতে হয়। এই স্বল্প চূণ ও খইয়ের আটা মিশ্রিত হইলেই, মাড় প্রস্তুত হয়। কাপড় বুনিবার পূর্ব্বে টানার সূতায় এই মাড় দিতে হয়। সূতার এই মাড় ভারতবর্ষে সত্যযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই মাড় যে, আবার কাপড়েও দিতে হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। পুরাণকথায় দেখিতে পাইবেন;

"দেবতন্তুবায় শিবদাস কাপড় বুনিয়া দেখিলেন, কাপড় গ্যাশ গ্যাশ থ্যাশ থ্যাশ করিতেছে, কাপড়ে আঁট নাই, জলুষ নাই।

তিনি গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে গণেশ দাদা ভাত খাইয়া বাহিরে এলেন। আহারের পর বিলম্ব হওয়ায় গণেশের হাতে মুখে ভাতের মাড় চট্ চট্ করিতেছে। ইহা দেখিয়া, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা নাচিয়া উঠিলেন। গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমে-ডীশ যেরূপ জলের টবে বসিয়া সুবর্ণের গুরুত্ব স্থির করিয়া, "ইউরেকা ইউরেকা" অর্থাৎ "পাইয়াছি পাইয়াছি" বলিতে বলিতে, টব হইতে উঠিয়া, উলঙ্গভাবে ঘুরিয়াছিলেন; বিশ্বকর্ম্মা সেরূপ ঘুরিলেন না; কিন্তু দেবসভার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নাচিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু বুঝিলেন, ব্যাপারখানা কি! আর তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মা, ভাতের মাড় প্রস্তুত করিয়া, কাপড়ে মাখাইয়া দিলেন। কাপড়ের বাহার দেখিয়া দেবতারা নৃত্য করিতে লাগিলেন।"

এই পুরাণ-কথায় পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, কাপড়ে মাড় দিবার ব্যবস্থা ভারতে সত্যযুগ হইতে বাহাল রহিয়াছে। তবে ভাল কাপড়ে ভাতের বদলে খইয়ের মাড়ই বব্যহৃত হইতেছে; খইয়ের মাড়ই উৎকৃষ্ট। মনুর সময়েও কিন্তু ভাতের মাড় প্রচলিত ছিল। তিনি বলিয়াছেন, দশ-তোলা সূতায় একতোলা মাড় দেওয়াই প্রশস্ত। বিলাতের কাপড়েও ভাতের মাড় চলে; তবে আলুর মাড়ও চলিয়া থাকে, চূণ না চলে, এরূপ নহে। কিন্তু মাড়ে মাটি মিশিয়াই অনেক কাপড়কে দেখিতে কলার মাজ, কাজে জেলে-কাচা করিয়া দেয়।

মাড় দেওয়ার পর সূতা আবার নাটাই-যন্ত্রে জড়াইতে হয়, জড়া-ইয়া আবার রৌদ্রে শুখাইতে হয়। শুষ্ক হইলে, ঐ মাড়-দেওয়া সূতা অন্যরূপ নাটাই-যন্ত্রে জড়াইতে হয়। জড়াইবার সময়ে বেশ করিয়া

শুখাইয়া লইতে হয়। এইরূপেই টানার জন্য সূতা প্রস্তুত হয়, আর একবার তন্তুবায়কে টানায় লাগিতে হয়। টানার সূতা যেরূপ নাটাইয়ে জড়িত হয়, তাহা পরে টানার চিত্রেই দেখিতে পাইবেন।

বস্ত্রের দীর্ঘ সূত্রকে টানা বলে; প্রস্থ সূত্রকে পড়েন বলে। আমরা যাহাকে টানা-পাতা বা টানা-ফেলা বলি, ঢাকা অঞ্চলের তন্তুবায়েরা তাহাকে "টানা সুত্‌না বা টানা-সূতানো" বলিয়া থাকেন। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে অশিক্ষিত লোকের উচ্চারণে স হ হয়। এই জন্যই আমাদিগকে ঢাকাই তন্তুবায়দিগের মুখে সূতার বদলে হুতা, সানার বদলে হানা ইত্যাদি শুনিতে হয়। টানা-পাতা অর্থাৎ "টানা-সুত্‌না" যে, পূর্ব্ববঙ্গীয় মুখে, "টানা-হুত্‌না" হয়; বস্তুতঃ "সূত্‌না" আর "হুত্‌না" যে, একই শব্দ; তাহা যাঁহারা না বুঝেন, তাঁহারাই গোলে পড়েন। বঙ্গীয় বয়নবিদ্যার ইতিহাস লিখিতে গিয়া, অনেক ইংরেজকেই এইরূপ গোলে পড়িতে হইয়াছে। তাঁহাদের বস্ত্রশিল্পঘটিত ইতিবৃত্তেই স স্থানে হ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু ঢাকার দীর্ঘপ্রবাসী অভিজ্ঞ ইংরেজেরাও সূত-নাটানী, সূত-মোড়া, সূত-বাতান প্রভৃতি লিখিতে লিখিতে, টানা-হুতানো বা টানা-হুতানা লিখিয়া বসিয়াছেন, ইহাও ত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাই হউক, নামে বড় আসে যায় না, কাজের কথাই কথা। পাঠকও কাজে দৃষ্টি রাখুন। পরপৃষ্ঠায় দেখুন, একটী তন্তুবায় বস্ত্রের জন্য টানা পাতিতেছেন;—এইরূপেই "টানা হুতানো" চলিতেছে। টানা পাতায় কাপড়ের পত্তন হয়; ঘরের যেরূপ ভিত্তি, কাপড়ের সেইরূপ টানা, টানায় দোষ হইলেই বস্ত্রে দোষ ঘটে, সে দোষ দূর করা কঠিন।

টানা-সূতানো।

চিত্রে দৃষ্টিপাত করুন। ঐ দেখুন, টানা পাতিবার পূর্ব্বে, তন্তুবায় দৈর্ঘ্যের দুই দিকে দুই যোড়া ছোট ছোট খুঁটা পুতিয়াছেন। দুই দিকের দুই যোড়া খুঁটার মধ্যে যে ব্যবধান রহিয়াছে, উহাতেই বস্ত্রের দৈর্ঘ্য সূচিত হইতেছে। মনে করুন, এই চিত্রস্থ তন্তুবায় একযোড়া দশ-হাতী বা পাঁচ-গজী দীর্ঘ কাপড় প্রস্তুত করিবেন। তাঁহাকে একযোড়া খুঁটা পুতিয়া, তাহার দশ হাত অন্তরে আর এক যোড়া খুঁটা পুতিতে হইতেছে। ঐ দেখুন, দুইদিকের দশ হাত টানায় বিশহাতী বা দশগজী এক যোড়া কাপড়ের পত্তন হইতেছে। কিন্তু কেবল দুই দিকের দুই যোড়া ক্ষুদ্র বংশকীলকেই কার্য্য পর্য্যবসিত হয় নাই। ঐ দেখুন, দুই পার্শ্বে পাঁচ পাঁচ দফায় দশ দফা শলাকা খাড়া ভাবে স্থাপিত হইয়াছে। দেখুন, বয়নীয় বস্ত্রের দৈর্ঘ্য অনুসারে কীলকচতুষ্টয় প্রোথিত হইয়াছে; আর সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের টানা পাতিয়া, তন্তুবায় দৈর্ঘ্যের কাজ করিতেছেন। অভিলষিত প্রস্থতার উপযুক্ত সমস্ত টানা পাতা হইলে, পরে পড়েন দিয়া, তন্তুবায় টানাকে দশগজী একযোড়া কাপড়ে পরিণত করিবেন। পড়েনে বস্ত্রের ওসার ঠিক হইবে; পড়েনেই কাপড়ের খোল প্রস্তুত হইবে। পড়ে-

নের সূতা যদি মিহি হয়, তাহা হইলে, সুন্দর খাপী কাপড় প্রস্তুত হইবে। ফলতঃ টানা হইতেছে, বস্ত্রের অস্থি-পঞ্জর ; পড়েনই বস্ত্রের মাংস। টানা ও পড়েনের সংযোগস্থলেই বস্ত্রের মাংসপেশী ও গ্রন্থি অবস্থিতি করিবে। টানা অস্থি-পঞ্জর ; তাই অপেক্ষাকৃত শক্ত সূত্র না হইলে,টানা প্রস্তুত হয় না। আর এই জন্যই সাধারণতঃ যে, টানার সূতা পড়েনের সূতা অপেক্ষা একটু মোটা হয়, তাহাও সকলেই স্ব স্ব বস্ত্রে দেখিতে পান। পড়েনের সূতা যত সূক্ষ্ম হইবে, কাপড় তত মিহি হইবে। পড়েন যত ঘনীভূত হইবে, কাপড়ও তত খাপী হইবে। ইহাই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম।

ঐ দেখুন, তন্তুবায় নিজের উঠানে বাসভবনের সংলগ্ন উদ্যানের বৃক্ষচ্ছায়ায় খোঁটা পুতিয়া, শলা লাগাইয়া, টানা পাতিতেছেন ; ঐ দেখুন. তাঁহার দুই হাতের দুইখানি সূত্রপূর্ণ নাটাই হইতে সূতা সরিতেছে, আর তিনি ঐ সূতা কৌশলপূর্ব্বক এক দিকের খুঁটা হইতে, শলার পাশ দিয়া,বরাবর ঘুরাইয়া লইয়া যাইতেছেন। টানা যে, একদিকের খুঁটা হইতে বরাবর আসিয়া, অপর প্রান্তের দুই খুঁটার উপর দিয়া,আবার ঐ প্রথম প্রান্তের অন্যতর কীলকে উপস্থিত হইতেছে ; পরে যে, টানা এই খুঁটাকে ঘিরিয়া, আবার অন্যপ্রান্তে ফিরিতেছে, ফিরিয়া ঘুরিয়া সেই প্রথম কীলকে উপস্থিত হইতেছে ; আবার ঐ কীলক হইতে দ্বিতীয় প্রান্তে আসিয়া, ঘুরিয়া গিয়া, প্রথম কীলকের সম্মুখস্থ কীলকে উপস্থিত হইতেছে ; তাহা পাঠক দেখিতে পাইতেছেন। এইরূপে টানার সূতা ক্রমাগত আসা যাওয়া করিতেছে ; সঙ্গে সঙ্গে তন্তুবায়ও দুই হাতে দুইখানি টানাপূর্ণ ছোট নাটাই লইয়া, আসা যাওয়া করিতেছেন। ঐ যে, পাঁচ পাঁচ দশ যোড়া শলা, উহারাই টানার মধ্যে সূত্রগুচ্ছের ভিতরে থাকিয়া.সমস্ত টানাকে যথাযথরূপে রাখিয়া দিতেছে।

কত প্রস্থ ও কিরূপ খাপ্পী কাপড়ে, কত টানা দিতে হয়, তাহা অভিজ্ঞ তন্তুবায়ের বিদিত আছে; তিনিও টানা পাতিবার সময়ে গণিয়া গণিয়া পাতিতেছেন। কিন্তু তন্তুবায় যদি অত্যন্ত অভিজ্ঞ হন, তবে তাঁহাকে এতদূর ক্লেশও সহ্য করিতে হয় না; তিনি টানায় পাতা সূতার গুচ্ছায়তন দেখিয়াই, বয়নীয় বস্ত্রের প্রস্থতার পরিমাণ স্থির করিয়া লইতে পারেন।

কৌশল শত শত! ঐ যে, দুইখানি টানাপূর্ণ নাটাই তন্তুবায়ের দুই হাতে দেখিতেছেন, ঐ দুইখানিরই বাঁটে দুইটী কাচ-বলয় সংলগ্ন আছে। এইরূপ কাচ-বলয় বা কাচের কড়া সংলগ্ন থাকে বলিয়াই, ঐ নাটাইকে কোন কোন স্থানে "কাচ-ঘূরা" বলিয়া অভিহিত হইতে হয়। কাপড়-কলের "ববিন্" যে কাজ করে, তন্তুবায়ের হাতের কাচ-ঘূরাই সেই কাজ করিয়া থাকে।

টানা কিরূপে পাতিতে হয়. সহৃদয় পাঠক তাহা দেখিলেন। কিন্তু এই টানা-পাতার পর, অনেক কৌশলে অনেক প্রক্রিয়া করিতে হইবে, তবে টানা তাঁতে উঠিবে। সূত্র-বস্ত্রে বংশই তন্তুবায়ের প্রধান সহায়। বাঁশের কীলকে টানা-পাতার খুঁটা প্রস্তুত হয়। ঐ যে, দেখিলেন, টানার ভিতর দশ দফা শলাকা, উহাও বংশশলাকা। দেখিবেন, সরু সরু বংশ-শলাকা নানাকার্য্যে নিযুক্ত হইবে। পল্লীগ্রামের পাঠক "শর" দেখিয়াছেন। প্রাচীন পাঠক বাল্যকালে সরস্বতীপূজার জন্য, শরবন হইতে শর কাটিয়া আনিয়াছেন। শরের ফুল-শুদ্ধ যে শীষ, তাহাকেই শর-ফুল্‌কা বলে। সেই শর-ফুল্‌কাও সরস্বতী-পূজার জন্য প্রবীণ পাঠক কাটিয়া আনিয়াছেন। এই শর-ফুল্‌কায় যে কোমল লঘু সরল সূক্ষ্ম দণ্ড বা ডাঁটা থাকে, তাহাতে অনেক পল্লীপাঠক মাছ-ধরা ছিপের পাত্‌না বা ফাতা

প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ শরকুল্‌কার ফাতা যে,জলাশয়ে ভাসিয়া,মাছ-ধরার পক্ষে সাহায্য করিয়া থাকে, তাহা অনেক পাঠক দেখিয়াছেন। মাছ টোপে ঠোকর দিলেই, ফাতা নড়ে ; মাছ টোপ ধরিলেই, ফাতা ডুবে, আর অমনই অভিজ্ঞ সুদক্ষ মৎস্যধারী ছিপে খ্যাঁচ মারেন, তৎক্ষণাৎ মৎস্য বড়ীশ-বিদ্ধ হয়। কিন্তু এখন আমরা মাছ ধরিতে বসি নাই, কাপড় বুনিতে আরম্ভ করিয়াছি। তবে কলা বেচিতে বেচিতেও নাকি রথ দেখা চলে, এই জন্য বস্ত্র-কৌশলের আভাস দিবার সময়েও, আমরা মাছ-ধরার কৌশলে ইঙ্গিত করিলাম ; "অধিকন্তু ন দোষায়।" আর সকল নাটকেরই অঙ্কের ভিতর গর্ভাঙ্ক থাকে, অঙ্কে অঙ্কে বিষ্কম্ভক থাকে, কথার ভিতর অবান্তর কথা থাকে। তাই কাপড় বোনার ভিতর মাছ-ধরা আসিয়া পড়িল। পরিচিত প্রথা অনুসারেই, এস্থলে অপ্রাসঙ্গি-কেও প্রাসঙ্গিক হইতে হইল। কিন্তু সরস্বতীপূজা ও মাছধরার কথা অবান্তর-কথা হইলেও, শরটা অবান্তর দ্রব্য নহে। বংশশলাকার বদলে অনেকস্থলে, স্থূল-বস্ত্রে, সূক্ষ্ম, সরল, পক্ব শরও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশম অধ্যায়।

টানায় শর-শলাকা।

শর ও শলার সহিত পাঠকের পরিচয় হইয়া গেল, এখন দেখুন, টানাকে তাঁত-কাঠে লাগাইবার পূর্ব্বে কিরূপ প্রক্রিয়ার অবলম্বন

করিতে হইতেছে। যে বস্ত্রের ওসার বা প্রাস্থ্য যেরূপ হইবে, সেই বস্ত্রের টানাগুচ্ছকেও সেই পরিমাণে বিস্তৃত করিতে হইবে। এই টানা-বিস্তারে শর ও শলাকা প্রধান অবলম্বন।
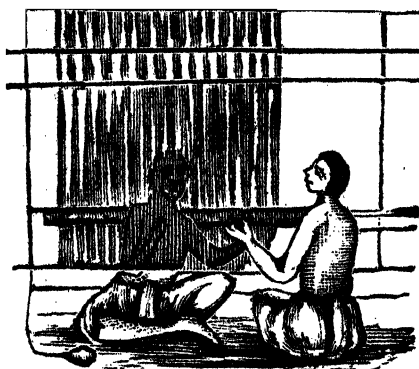
টানা-বিস্তার।

এই দেখুন, টানা-বিস্তারের চিত্র। তন্তুবায় নিজের তাঁত-ঘরের আড়ায় টানা ঝুলাইয়াছেন। ঐ যে দেখিতেছেন, টানাগুলি প্রস্থ ভাবে বিলম্বিত হইয়াছে, উহাতেই বস্ত্রের প্রাস্থ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখন দেখুন, দুইজন তন্তুবায় টানায় শর বা শলাকা পরাইতেছেন।

একটা কথা বলিয়া রাখি। কোন কোন তন্তুবায় এইরূপে ঘরের আড়ায় টানা ঝুলাইয়া, শর শলাকা সাহায্যে, টানার প্রাস্থ্য ঠিক করিয়া লন; কেহ কেহ ঘরের আড়ায় টানা না ঝুলাইয়া, একেবারেই তাঁতের আড়ায়—অর্থাৎ তাঁত-কাঠে—টানা লাগাইয়া, সেই তাঁত-কাঠেই টানার ওসার ঠিক করিয়া লইয়া থাকেন।

প্রথম প্রক্রিয়ায়, ঘরের আড়ায় টানার প্রস্তুতা ঠিক করিয়া, টানায় শর-শলাকা লাগাইয়া, পরে টানা তাঁত-কাঠে লাগাইতে হয়। দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায়, টানার গোছা তাঁত-কাঠ লাগাইয়া, সেইরূপ প্রাস্থ্য স্থির করিতে হয়। তাঁত-কাঠের টানাতেই শর শলাকা লাগাইতে ও সাজা-ইতে হয়।

এই যে, শলাকার সংযোগ ও সজ্জা, ইহা একান্ত কৌশলে সম্পন্ন হয়। প্রক্রিয়া অনেক, অনেক গ্রন্থি ফাঁস দিতে হয়; টানা বসাইবার সময়ে অনেক দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। টানা গুছাইবার নানারূপ কৌশল আছে, ভিন্ন ভিন্ন তন্তুবায়বংশে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি চির-পরিচিত। শিবদাস মূলসূত্র ধরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই মূল-সূত্রের নানারূপ উন্নতি বিস্তৃতি হইয়াছে। দেখিতে পাইবেন, যে সকল প্রক্রিয়া ঢাকায় চলে, ঠিক সেই সকল প্রক্রিয়া শান্তিপুরে চলে না; শান্তিপুরে যাহা চলে, অম্বিকা কাল্‌নায় তাহা চলে, কিন্তু ফরাসডাঙ্গায় তাহা চলে না। আবার ফরাসডাঙ্গার প্রথা-পদ্ধতি অক্ষুণ্ণভাবে কল্‌মের তন্তুবায়-কুলে পরিগৃহীত হয় না। কল্‌মের উড়ানী যে প্রথায় প্রস্তুত হয়, সে প্রথা অন্যত্র দেখা যায় না। কল্‌মের উড়ানীর ছিলায় একটু অসাধারণত্ব দেখা যায়। কল্‌মে ও চন্দ্রকোণার তন্তুবায়কুলে যে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, আর কোন স্থলের তন্তুবায়কুলের সহিত কল্‌মের সেরূপ সাদৃশ্য থাকে না। কিন্তু এই কল্‌মে ও চন্দ্রকোণার মধ্যেও আবার বৈসদৃশ্য দেখিতে পাইবেন। কল্‌মের উড়ানীর মত উড়ানী চন্দ্র-কোণায় পাইবেন; কিন্তু ঠিক কল্‌মের উড়ানী চন্দ্রকোণায় পাইবেন না। আবার চন্দ্রকোণায় ও রামজীবনপুরে যেরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিবেন, কল্‌মে চন্দ্রকোণায় সে সৌসাদৃশ্য দেখিবেন না। অদূরে নাড়াজোলে রাম-

জীবনপুর ও চন্দ্রকোণার ভোল দেখিতে পাইবেন, কিন্তু অবিকল ঐক্য সেখানেও পাইবেন না। ভিন্ন ভিন্ন তন্তুবায়বংশে প্রভেদ ঘটিয়াছে; আবার একবংশেরও শাখায় শাখায় স্থানভেদে ভেদ হইয়াছে। কলিকাতায় শিমলার ভোল শিমলা ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় না। আবার কিছুদিন পূর্ব্বের কথাই বলিতেছি; বরাহনগরের ধরণটা বরাহনগরেই আবদ্ধ ছিল।

এখন দেখুন, চিত্রে ঐ দুই তন্তুবায় কি করিতেছেন। টানার তলকাষ্ঠের দুই দিকে দুই জন বসিয়াছেন। দুই জনে মিলিয়া, টানায় যথাযথরূপে শলা সংলগ্ন করিতেছেন। দুই জনেই টানার মুখে গ্রন্থি দিয়া টানাকে তাঁতকাঠে লাগাইবার উপযুক্ত করিতেছেন। ঘরের আড়ায় টানা খাড়াভাবে অর্থাৎ লম্বরূপে ঝুলিতেছে। এই টানা যাঁহারা একেবারেই তাঁত-কাঠে লাগাইয়া দেন, তাঁহাদের টানাকে, লম্বভাবে নহে—পরন্তু সমান ভাবে—তাঁতের দুই কাঠে সংলগ্ন হইতে হয়। পরের চিত্রে এক প্রক্রিয়ায় দুই প্রক্রিয়ার উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

একাদশ অধ্যায়।

—*—

তাঁত-কাঠে টানা-যোগ।

এই যে চিত্র, ইহাতে দেখিতেছেন; যে টানা ঘরের আড়ায় গোছান সাজান হইয়াছে, সেইখানেই যে টানার শলাকা বা শর পরান হইয়াছে, সেই টানাই পরে তাঁত-কাঠে লাগান হইয়াছে।

আবার টানা যদি ঘরের আড়ায় না ঝুলাইয়া, তন্তুবায় প্রথমেই তাঁত-কাঠে লাগাইতেন, তাঁত-কাঠে সংলগ্ন টানাতেই যদি তিনি শর-শালা বিছাইতেন, তাহা হইলেও, শেষে টানাকে এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইতে হইত।

তাঁতে টানা।

চিত্রে দেখিতেছেন, তাঁতের একদিকের কাঠ দুইটী খোঁটায় সংলগ্ন রহিয়াছে; অন্যদিকের কাঠ একটী তন্তুবায় নিজের হাতে ধরিয়া আছেন। সচরাচর তন্তুবায়ের বাড়ীর প্রাঙ্গণে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। অনন্তর তাঁত-কাঠ, টানাযুক্ত হইলে, তাঁত-ঘরে নীত ও যথাস্থানে যথাযথরূপে রক্ষিত হয়।

এখন দেখুন, তিন জনে কি কাজ করিতেছেন। দেখুন, সমস্ত টানা-সূত্রই তাঁত-কাঠে সংলগ্ন হইয়াছে; তাঁত-কাঠের নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যেই বপনীয় বস্ত্রের প্রাস্থ্য স্থির হইয়াছে। ঐ দেখুন, বামপ্রান্তের তন্তুবায় একগাছি বেত দিয়া, টানার সূতা সমান ভাবে বিস্তৃত করিয়া দিতে-ছেন। এই যে বেতগাছটী, ইহার মুখ ছেচিয়া থেঁতলাইয়া, বুরুষ

বা কুঁচীর মত করা হইয়াছে। ঐ মুখটী দিয়া, তন্তুবায় টানার সূতা-গুলি সমান্তরালে সাজাইয়া দিতেছেন। কলের এই কাজ নানারূপ কৌশলময় যন্ত্রে সম্পন্ন হয়; আমাদের তন্তুবায় কিন্তু একটু বেত দিয়াই সর্ব্বকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছেন। ঐ দেখুন, ঐ বেতের কুঁচি-তেই টানার সমস্ত সূত্র সমান্তরালে ও পরস্পর-সমান-ব্যবধানে, এরূপে সুসংস্থিত হইতেছে যে, পড়েন ফেলিবার সময়ে আর বস্ত্রবয়ন-কারীকে কোনরূপ অসুবিধাভোগ করিতে হইবে না। টানার সূতা-গুলি ঘন ঘন সজ্জিত হইয়াছে, অথচ কাহারও গায়ে কেহ লাগিয়া ঠেকিয়া থাকিতেছে না। ঐ দেখুন, মধ্যস্থলে একজন একগাছি বেত লইয়া দণ্ডায়মান। ঐ যে বেত্র, উহা স্থিতি-স্থাপকতা-যুক্ত। ঐ বেত্রের দ্বারা ঐ ব্যক্তি টানার সূতায় মধ্যে মধ্যে কোমলভাবে আঘাত করিতে-ছেন; আর স্থিতিস্থাপকতাযুক্ত বেত্রের মৃদু আঘাতে টানা ঝাড়া হই-তেছে; টানার সমান্তরালতাও স্থির হইতেছে। টানা এইরূপে তাঁতকাষ্ঠে সুরক্ষিত ও সজ্জিত হইলে পর, ঐ দীর্ঘ টানা তাঁত-কাঠে জড়াইয়া তাঁত-ঘরে লইয়া যাওয়া হইবে। সেখানে কিন্তু বয়নারম্ভের পূর্ব্বে টানাকে পড়েন লইবার উপযুক্ত করিতে হইবে। নিম্নে সেই প্রক্রিয়ার উপলব্ধি করুন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

টানার ঘরা।

ঘরা-আঁটা।

এই চিত্রে দেখুন, তন্তুবায় অনন্যমনা হইয়া, টানার ঘরা ঠিক করিয়া দিতেছেন। পড়েনের সূতা নিজের উদরে লইয়া, মাকু যখন এই টানার ভিতর দিয়া,যাওয়া আসা করিবে; তখন এই ঘরা-আঁটা কৌশলই মাকুর পথ মুক্ত রাখিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বংশই তন্তুবায়ের প্রধান সহায়। এই দেখুন, তিনি চাঁচা ছোলা তেলা পাতলা বাখারীর সাহায্যেই, সর্ব্বকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন। এইরূপেই তিনি পড়েনের পথ মুক্ত করিয়া

রাখিতেছেন। যাহাতে পড়েন লইয়া টাকু অবাধে যাওয়া আসা করিতে পারে, তন্তুবায় তাহারই ব্যবস্থা করিতেছেন। এই কার্য্যেও যে, নানারূপ কৌশল আবশ্যক, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ই সকলের মূল। তন্তুবায়ের ধৈর্য্য দেখিলে, অতিধীরকেও অবাক্ হইতে হয়।

ঘরা-করার চিত্রে টানা-সজ্জার যে রহস্য দেখিয়াছেন, তদ্ব্যতীত রহস্যও উহাতে আছে। কাপড়-বোনার সময়ে দেখিতে পাইবেন,কতক-গুলি রজ্জু উপরিস্থ আড়কাঠে সংলগ্ন থাকিয়া,চিরণকাঠে যুক্ত রহিয়াছে। ঐ রজ্জুগুলিই দীর্ঘ চিরণ-কাঠকে যথাস্থানে রাখিতেছে; আবার যথা-মুহূর্ত্তে যথাস্থানে চিরণকাঠকে সরাইতেছে। চিরণকাঠও পড়েনর সূতাকে মধ্যে মধ্যে ঠেলিয়া ঠেষিয়া ঘনীভূত করিয়া দিতেছে। ঐ যে লম্বমান রজ্জু, উহাই তন্তুবায়-ভাষায় নাঁচুনী বলিয়া পরিচিত। বস্ত্রবয়নকালে ঐ রজ্জু বা সূত্রকে উঠিতে নামিতে হয়; ঠিক যেন তাহাকে নাচিতে হয়। এই জন্যই উহার নাম নাঁচুনী। আর ঐ যে, ঘরার কথা কহিয়াছি, উহাই তন্তুবায়ের অভিধানে "বূ, বূয়া বা বোয়া" বলিয়া পরিচিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

তাঁতে—বোনা।

ভারতে শয়ান-তাঁতেরই চিরন্তন চলন। মিশর দেশের তন্তুবায়েরা ভারতের ন্যায় শয়ান-তাঁতেই কাজ করিতেন না; মিশর দেশের তন্তু-বায়েরা প্রধানতঃ খাড়াতাঁতেই কাজ চালাইতেন। ইউরোপের প্রায়

সকল প্রদেশের ন্যায়, বিলাত প্রদেশেও খাড়াতাঁতেরই আদর অধিক। এত যে কলের আধিপত্য,বাষ্প তাড়িতাদির এত যে প্রাদুর্ভাব; তথাপি ইউরোপের সর্ব্বত্র এখনও হাতের তাঁতে কাজ চলিতেছে। বিলাতের অনেক ভাল ভাল কাপড় এখনও হাতের তাঁতে প্রস্তুত হইতেছে। বিলাতের হাতের তাঁতে আর আমাদের হাতের তাঁতে মূলতঃ তাদৃশ প্রভেদ না থাকিলেও, গঠনে তারতম্য আছে। কিন্তু এই যে তারতম্য, ইহা দর্শনে যত, কার্য্যে তত নহে। আমাদের দীনহীন তন্তুবায়ের পক্ষে যে, বংশই প্রধান সম্বল, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। সুতরাং আমাদের তন্তুবায়কে ঝাড়ের বাঁশেই সব কাজ করিতে হয়।
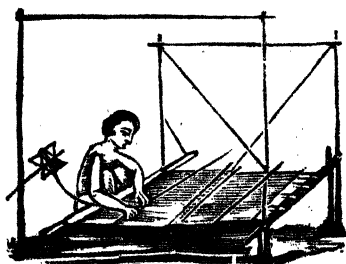
তাঁতশালা।

আদ্যন্ত সকল কার্য্যেই দেখিতেছেন, তন্তুবায়কে প্রধানতঃ বংশেই নির্ভর করিতে হইয়াছে। এই দেখুন, নিজের তাঁতশালায়ও তন্তুবায়কে বাঁশেই সব কাজ করিতে হইতেছে। বিলাতে বাঁশ নাই, বিলাতের তাঁতে বাঁশ নাই। তাঁতের আড়া খোঁটা পাড় প্রভৃতি সমস্তই বিলাতের সূত্রধরকে কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। আমাদের দীনহীন তন্তুবায় সূত্রধরের সাহায্য লন না। বয়নাদি-সংসৃষ্ট প্রায় সর্ব্ব উপকরণই

তিনি নিজে প্রস্তুত করিয়া লন। আর পাকা বাঁশে কাজ সহজে হয়,ভাল হয়; তাই তন্তুবায় বংশেই নির্ভর করিয়া থাকেন। পাঠক পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, ঘরা ও বুয়া তুলিবার সময়ে, তন্তুবায়কে যে বাঁশের সাহায্য লইতে হইয়াছে, এই কাপড়-বোনার সময়ে তাহাকে সেই বাঁশেই নির্ভর করিতে হইয়াছে।

এই দেখুন, বঙ্গীয় তন্তুবায়ের তাঁতশালাটী কিরূপ তাঁত-যন্ত্রে সুশোভিত। যাঁহার বিচিত্র মলমলের সৌকুমার্য্য দেখিলে, দেব-তন্তু-বায় শিবদাসকেও বিস্ময়ে বিহ্বল হইতে হইত; যাঁহার ১৫০০ নম্বরী সূতার অদৃশ্য অস্পৃশ্য "আব-রেঁায়া" দেখিলে এখনও মেঞ্চেষ্টারের অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক-শিল্পীদিগকেও হতবুদ্ধি হইতে হয়; সেই ঢাকাই তাঁতীর তাঁতশালা বংশনির্ম্মিত, তাঁহার তাঁতযন্ত্র বাঁশে গড়া।

ঐ ত চিত্রেই দেখিতেছেন, তাঁত-ঘরের মধ্যস্থলে একটু চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের চারিকোণে চারিটী বাঁশের খুঁটী পোঁতা রহিয়াছে। ঐ দেখুন, দুইদিকের দুই যোড়া খুঁটীর উপর দুইখানি বাঁশের আড়া, দড়ী দিয়া, সমানভাবে সংলগ্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। তার পর দেখুন, ঐ দুই আড়ার উপর একখানা বংশনির্ম্মিত আড়া আড়াআড়ি পড়িয়া আছে। দেখুন, ঐ তৃতীয় আড়াখানি তাঁতের ঠিক সমান্তরালে তাঁত ও তাঁতীর মাথার উপর রহিয়াছে। এই মাথার আড়া হইতে রজ্জুরাজি-বিলম্বিত হইয়া টানার উপরিস্থ চিরণ-কাঠে যুক্ত হইয়াছে। এই রজ্জুরাজি তন্তুবায়ের হস্তে সুকৌশলে চালিত হইয়া, তাঁতের বস্ত্রবয়নে সাহায্য করিতেছে। রজ্জুরাজি সুকৌশলে সুপথে চালিত হইয়াছে বলিয়াই, বস্ত্রের টানা,পড়েন—অস্থি মাংসে, দেহে অঙ্গে, সামঞ্জস্য রাখি-তেছে। ঐ দেখুন, তাঁতী হাতে পায়ে কাজ করিতেছেন। লম্বমান রজ্জু-

রাজির কৌশলপূর্ণ প্রয়োগে ব্যবহারে তিনি ঐ যে, বয়নকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, উহা দেখিলে, অনভিজ্ঞকে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া থাকিতে হয়। কিসের জন্য কি হইতেছে, তাহা অনভিজ্ঞের পক্ষে সহসা বুঝা অসাধ্য। রজ্জু উঠিতেছে, নামিতেছে, তন্তুবায়ের হস্ত চলিতেছে, পদ চলিতেছে, বস্ত্র বপিত হইতেছে ; ইহাই মাত্র অনভিজ্ঞেরা বুঝিতে পারেন।

তন্তুবায়ের হাতে সূত্রাদি সুরক্ষিত হইতেছে, তাঁহার পাদচাপে তাঁত-কাজ চলিতেছে। তাহাতেই পড়েনের সূতা, টানার ভিতর সুরক্ষিত সুসজ্জিত হইতেছে। পড়েনের সূতা যে মাকুর ভিতর রহিয়াছে,

মাকুর চিত্র।

তাহার চিত্র দেখুন। এই সেই শিবদাসের মাকু। বিলাতের মাকু এক ফুট লম্বা, দেখিতে নৌকার মত। আমাদের মাকুও প্রায় ঐরূপ। সূত্রগর্ভ হইয়া, টানার উপর সূতা ফেলা, সকল টাকুরই উদ্দেশ্য। ফ্লাই-শটল বা ঠকঠকী মাকুও ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতেছে। বিলাতেরই জন কে নামে একজন শিল্পী ১৭৩৩ অব্দে ঐ ফ্লাই-শটলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বহুদিন অগ্রাহ্য অকর্ম্মণ্য থাকিয়া, ফ্লাই-শটল কিছুদিন হইল, আদর পাইয়াছে। আমাদের দেশেও অনেক দিন হইল আসিয়াছে; শ্রীরামপুরে অনেক দিন হইতে চলিতেছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিলাতের তাঁত মাকু।

বলিয়াছি ত মূলে হাতের তাঁত ও চলিত মাকু, ভারতেও যেরূপ. বিলাতেও প্রায় সেইরূপ। তবে বিলাতের হাতে-চলা তাঁতখানা দেখিতে যেরূপ সুন্দর, ভব্য. সভ্য. আমাদের দীনদুঃখী শিবদাস-তনয়ের তাঁত-যন্ত্র দেখিতে সেরূপ সুন্দর, সভ্য, ভব্য নহে; কিন্তু স্থূলে মূলে প্রভেদ নাই। বিড়ালের অঙ্গ-সৌষ্ঠবের তারতম্য আছে। কিন্তু বিলাতের বিড়ালে যেরূপ ইন্দুর ধরে, ভারতের বিড়ালেও সেইরূপ ইন্দুর ধরে। বিলাতের মাকুটী দেখিতে বেশ স্থূলোদর, গাড়ল-গুপ্‌সো। কিন্তু পড়েনের সূতা তাহাতে যেরূপ থাকে, আমাদের মাকুতেও সেইরূপ থাকে। মাকু দেখেন নাই. এরূপ পাঠক বিরল। বিবাহের রাত্রে যিনি মাকু হাতে করেন নাই, তাঁহার বিবাহই অসিদ্ধ।

"কড়ী দিয়ে কিন্‌লাম,
দড়ী দিয়ে বাঁধলাম,
হাতে দিলাম মাকু,
একবার ভ্যা কর ত নাকু।"

মাকু হাতে করিয়া এই মন্ত্র যিনি পড়েন নাই, বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে তিনি বিবাহই করেন নাই। বস্ত্র-শিল্পের বড় আদর না হইলে, সকল শুভ-সংস্কারেই কাটনা-কাটা সূতার ঘনিষ্ঠ সংস্রব থাকিত না। বিবা-হের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারেও তাহা হইলে, মাকুর ঘনিষ্ঠতা ঘটিত না। ফলতঃ মূলসূত্রে বয়ন-বিস্তার আভাস দেওয়াই, এই ক্ষুদ্র পুস্তকার

উদ্দেশ্য। বস্ত্র-শিল্পে লোকের অনুরাগ যদি, এই পুস্তিকার কল্যাণে, যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়; যদি এই সামান্য প্রবন্ধেই শিল্পলিপ্সুদিগের ঔৎসুক্য একটু উত্তেজিত হয়; তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। বয়ন-বিদ্যায় সম্পূর্ণরূপ শিক্ষা দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে, ক্ষুদ্র পুস্তকে সকল কৌশল প্রকাশ করাও সুবোধ্য নহে। বিলাতী তাঁতের মত তাঁতও বঙ্গদেশের অনুপযোগী নহে। এখনকার নূতন তাঁতে কতকটা বিলাতী আমেজ আসিয়াছে। বিলাতী তাঁতে যত খরচ পড়ে, তত খরচ না করিয়াও এ দেশের নূতন তাঁতে বিলাতী উপযোগিতার সমাবেশ করা চলিতেছে।

ঔৎসুক্য বাড়িলেই, জ্ঞানলিপ্সা বাড়িবে, জ্ঞানলিপ্সা বাড়িলেই মন শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইবে। লোকের শিক্ষা-প্রবৃত্তি বলবতী হইলেই শিল্পের বিস্তৃতি হইবে। অধ্যবসায় থাকিলেই উন্নতি হইবে। বয়ন-বিদ্যা যে, একটী সুকুমার-বিদ্যা, ইহা যে দিন দেশের অধিকাংশ লোকে হৃদয়ঙ্গম করিবেন সেই দিনই বস্ত্র শিল্পের উন্নতি-পথ অক্ষুণ্ণ হইয়া সকল শিল্পার্থীকেই পদবিক্ষেপে আসর দিবে। স্বদেশীর উপর অনুরাগ রাখিয়া আমাদিগকে বিদেশীর গুণগ্রাহী হইতে হইবে। "পুষ্পেভ্যো মধুসংগ্রহঃ।" মধুকর যেরূপ উদ্যান-কুসুম এ বনকুসুমের মধু লইয়া নিজের চাক অমৃতোপম মধুপ্রবাহে পূর্ণ করে, আমাদিগকেও সেইরূপ বিদেশীয় গুণ লইয়া স্বদেশীয় গুণে মিশাইতে হইবে। এবং এইরূপ মিশ্রণে এক অপূর্ব্ব গুণরাশির সমাবেশ করিতে হইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দেশী বিলাতীর তুলনা।

দেশী তাঁত ও দেশী মাকুর গুণ শিরোধার্য্য করিয়াও আমরা বিলাতী তাঁত ও বিলাতী মাকুর প্রশংসা করিতে পারি। বিলাতী তাঁতে খরচ কিছু অধিক হয়। বাঁশের বদলে কাঠের ব্যবহার করিতে গেলেই কিঞ্চিৎ ব্যয়বাহুল্য সহ্য করিতে হয়। কিন্তু বিলাতী তাঁতে যে কাজ সহজে অধিক মাত্রায় হয়, তাহারও শ্রীরামপুর প্রভৃতির নূতন তাঁতেই পরীক্ষা হইতেছে। বরদা, শ্রীরামপুর, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যে নূতন তাঁতের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি হইতেছে, তাহাতে বিলাতীর আমেজ আছে। যেটুকু বিলাতী ভাব লওয়া আবশ্যক, নূতন তাঁতে সেটুকু লওয়া হইয়াছে। ইহাতে দোষ নাই। পুরাতন বংশপ্রধান তাঁতে খরচ নাই বলিলেই হয়, নূতন তাঁতে খরচ আছে। কিন্তু যে খরচ আছে। তাহা তাঁতীর পক্ষে অসাধ্য বা অসহ্য নহে। যখন ২৫।৩০ টাকায় একখান নূতন তাঁত পাওয়া যাইতেছে, আর যখন এই নূতন তাঁতে কাজ সহজে এবং অধিক মাত্রায় হইতেছে, তখন সামান্য ব্যয়ের জন্য কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। আবার বিলাতের প্রচলিত হাতের তাঁত যে এদেশে সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা ত সকলেই দেখিয়াছেন। কেন আমরা বিলাতী তাঁতের মত তাঁত এ দেশে প্রস্তুত না করিব?

তার পর টাকুর কথা। আমাদের মান্ধাতার টাকুতেও কাজ চলিতেছে সত্য। কিন্তু বিলাতী টাকু বয়নকার্য্যের পক্ষে যে, দেশী টাকু অপেক্ষা অধিক উপযোগী, তাহাও ত হাতে কাজে প্রতিপন্ন হইতেছে।

তুলনা করা কঠিন নহে। বিলাতী টাকুর উদরে অধিক সূতা ধরে; উদরস্থ চক্রে সূত্রনিঃসারণ কার্য্য সহজে ও সুচারুতররূপে সম্পন্ন হয়। বিলাতী টাকু প্রস্তুত করা যে, এতদ্দেশীয় কর্ম্মকারদিগের পক্ষে দুঃসাধ্য নহে, তাহাও স্বতঃসিদ্ধ এবং সহজ প্রতিপাদ্য। আমাদের দেশের মিস্ত্রীরা যেরূপ বুদ্ধিমান্, সেইরূপ অধ্যবসায়শীল। কল কুলুপে ইহাঁরা বিলাতের চবস্ প্রভৃতিকেও পরাস্ত করিয়াছেন। নাটাগড়ের কর্ম্মকারেরা এখনও বনমালীর নাম রাখিতেছেন, এদেশের মিস্ত্রীরা এখন সর্ব্ববিধ কল যন্ত্রেই দক্ষতা দেখাইতেছেন, ছুরী কাঁচি প্রভৃতির কার্য্যকৌশলে বঙ্গের শিল্পীরা যোগ্যতা দেখাইতেছেন। জরীপ পরিমাণের যন্ত্রতন্ত্রেও ইহাঁরা অদক্ষ নহেন। নানাস্থানের রেলের মিস্ত্রীখানায় নানারূপ যন্ত্রতন্ত্রের কাজ করিয়া এদেশের শিল্পীরা সর্ব্বকর্ম্মে দক্ষ হইতেছেন। কেহ কেহ যে রেলের ইঞ্জিন পর্য্যন্ত গড়িতে পারেন, তাহারও মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা হইতেছে। তাঁত ও মাকুর উন্নতিকল্পে যে এদেশের শিল্পীরা অসমর্থ নহেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। শ্রীরামপুর ও কলিকাতায় যে নূতন তাঁত প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতেই ত শিল্পীদিগের যোগ্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

ষোড়শ অধ্যায়।

উপসংহার।

তাঁতের উন্নতি হইতেছে, আরও হইবে। আপাততঃ বিলাতী হাতের তাঁতকে সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগকে দেশী তাঁতকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে হইবে। বিলাতের যে তাঁত বাষ্প বা তাড়িতে চলে,

তাহার কথা এখন কহিতেছি না। কলঘটিত বয়ন-বিদ্যা আমরা সবিস্তারে কহিতে বসি নাই। বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, ভারতের মত বহুলোকপূর্ণ দেশে—বহুশিল্পসমন্বিত শ্রামিকপ্রধান দেশে হাতের তাঁত চালাইতে ক্ষান্ত থাকা একান্ত অকর্ত্তব্য। হিসাবে দেখিতেছি, "ভারতের জন্য যত বস্ত্র আবশ্যক হইতেছে, এখনও তার অর্দ্ধেক এদেশের কলে ও হাতের তাঁতে প্রস্তুত হইতেছে, এদেশের কলে যাহা হয়, তিন গুণেরও অধিক এদেশের হাতের তাঁতে হইতেছে।"

এ হিসাবকে আমরা অভ্রান্ত বলিয়া মনে করি না। আমরাও যথা-সাধ্য অন্বেষণ গবেষণা করিয়া দেখিতেছি, এখনও ভারতের তাঁতীর তাঁতে যাহা হইতেছে, বিলাত হইতে তদপেক্ষা কমই আসিতেছে। ভারতের হাতের তাঁত যে এখনও বস্ত্রশিল্পকে সম্পূর্ণ অপঘাত হইতে বাচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট, ইহাই তাঁতীর পরম ভাগ্য।

তাঁত টাকু ও চরকা মাকুর দিকে আমাদিগকে অধিকতর ও স্থির দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সমগ্র দেশের পক্ষে দেশী তাঁতই অধিক উপযোগী, তবে ঐ স্বদেশী তাঁতেও বিদেশী ভাঁজ দিয়া উন্নতি করিতে হইবে। টাকু ও চরকার উন্নতি করা কঠিন নহে। যন্ত্রতন্ত্র শিবদাসের বংশে যাহা আছে, তাহা অগ্রাহ্য নহে। এখন চাই সার্ব্বজনীন উৎসাহ, অনুরাগ, নির্ব্বন্ধ এবং অধ্যবসায়। বস্ত্রশিল্প ও বয়ন-বিদ্যায় লোকের অনুরাগ বৃদ্ধি করাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য।

সম্পূর্ণ